দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর একজন ‘ধর্মযোদ্ধা’

— পৃঃ ১৩

আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না

— পৃঃ ২৩

৭২ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ৯ ডিসেম্বর ২০১৯।। ২২ অগ্রহায়ণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

রাজ্যপাল সব ক্ষেত্রে মন্ত্রীর কথায় চলতে বাধ্য নন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দেন, কিন্তু সংবিধান বলেনি যে সেটা মানতেই হবে। এটা অনেক নেতা-মন্ত্রীর অপছন্দ হতেই পারে।

## রাজ্য বনাম রাজ্যপাল

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৯ ডিসেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**



দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩



**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57



দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com



ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৫

**এন আর সি হবেই : 'অনুপ্রবেশকারী' এবং 'উদ্বাস্তু'র পার্থক্যটি বোঝা দরকার** □ বিশ্বামিত্র □ ৬

**খোলা চিঠি : গো-হার বিজেপির, একুশ কি পাক্কা দিদির** □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

**পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন জিততে শুধু মোদী-অমিত শাহের ম্যাজিক নির্ভরতা কমাতে হবে** □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৮

**রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার হাতের পুতুল নন** □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১১

**রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর একজন 'ধর্মযোদ্ধা'** □ সুজিত রায় □ ১৩

**পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসন : সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে** □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ১৫

**সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণ হলো বেআইনি দখলদারিত্ব অধিকারে পর্যবসিত হয় না** □ কে এন মণ্ডল □ ১৭

**আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না** □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ২৩

**মহারাষ্ট্রে ভূলুণ্ঠিত ন্যায়, জয়ী রাজনীতি** □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ২৫

**মূল্যবোধের শিক্ষাই কর্তব্যবোধের শিক্ষা দেয়** □ রমেশ পোখরিওয়াল □ ২৭

**বালাসাহেবের মৃত্যুর পর থেকে শিবসেনার অবক্ষয় শুরু** □ অভিমন্যু গুহ □ ২৮

**কুমারী পূজা জীবন্ত শক্তির উপসনা** □ স্বামী বেদানন্দ □ ৩১

**গল্প : বিপ্রতীপ** □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৩৫

**প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রাঙ্গনে** □ ইন্দ্রনীল মজুমদার □ ৩৭

**পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি ভীতির সত্য-মিথ্যা** □ দেবযানী ভট্টচার্য □ ৪৩

**উপনির্বাচনেও উন্নয়ন বাহিনীর তাণ্ডব** □ রণিতা সরকার □ ৪৬


## নিয়মিত বিভাগ


**উবাচ : ১০** □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯** **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৬ ডিসেম্বর
২০১৯

প্রকাশিত হবে
১৬ ডিসেম্বর
২০১৯

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## রামজন্মভূমি আন্দোলন

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পথ অনেকাংশে বাধামুক্ত হয়েছে। রায় পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে একটি ইসলামিক সংগঠন আবেদন করলেও, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিশ্বাস করেন, রামমন্দির হবেই। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় রামজন্মভূমি আন্দোলন। অযোধ্যার একটি আন্দোলন কীভাবে সারা দেশের হয়ে উঠল তারই তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস প্রকাশ করবে স্বস্তিকা।

**দাম : বারো টাকা মাত্র**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

**AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**


সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## রাজ্যপাল গণ্ডি লঙ্ঘন করেন নাই

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর নিতান্তই অবসর জীবন যাপনের জন্য যে রাজভবনের বাসিন্দা হন নাই—তাহা এতদিনে পরিষ্কার হইয়াছে। রাজ্যপাল বুঝাইয়া দিয়াছেন, তিনি তাঁহার সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। সাংবিধানিক গণ্ডির ভিতর থাকিয়াই তিনি সক্রিয়ভাবে তাঁহার কর্তব্য পালন করিবেন। নীরব দর্শক হইয়া তিনি সময় অতিবাহিত করিবেন না। রাজ্যপাল সংবিধান বুঝেন না—ইহা তাহার অতি বড় শত্রুও বলিবে না। দেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞদের ভিতর তিনি একজন। অতএব সহজেই বুঝা যায়, রাজ্যপাল যাহা করিতেছেন, তাহা সংবিধান সম্মতভাবেই করিতেছেন। রাজ্যপাল সক্রিয় হইলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবিশেষ অসুবিধা। কেননা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য প্রশাসনকে নির্লজ্জ স্বজনপোষণের একটি খেলাঘরে পরিণত করিয়াছেন। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করিয়া তুঘলকি কায়দায় প্রশাসন চালাইতেছেন। আকাশছোঁয়া দুর্নীতিতে সমগ্র প্রশাসন নিমজ্জিত হইয়াছে মূলত তাহারই প্রচেষ্টায়। প্রশাসনের এই চেহারা চরিত্রটি কেহ ধরিয়া ফেলিলে সর্বনাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। কাজেই রাজভবনের বাসিন্দা যতই সক্রিয় হইতেছেন, সংবিধানের গণ্ডির ভিতর অবস্থান করিয়া যতই প্রশাসনের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ধরিতে চাহিতেছেন, ততই মুখ্যমন্ত্রী হুংকার ছাড়িতেছেন। বলিতেছেন, রাজ্যপাল সমান্তরাল প্রশাসন চালাইতেছেন। জেলা সফরের সময় রাজ্যপাল জেলার আধিকারিকদের সহিত বৈঠক করিতে চাহিলেও, সরকারি আধিকারিকদের রাজ্যপালের বৈঠকে অংশ না লইতে নির্দেশ পাঠানো হইয়াছে নবান্ন হইতে।

সমস্যা হইতেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সংবিধানটি পাঠ করেন নাই। সংবিধান রাজ্যপালকে কী কী ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে, তাহাও মুখ্যমন্ত্রী জানেন না। মুখ্যমন্ত্রী ভাবিয়াছিলেন দিল্লি হইতে কোনো নিরীহ ব্যক্তি আসিয়া রাজভবনের বাসিন্দা হইবেন। আর তিনিও মহোৎসাহে স্বেচ্ছাচারিতা করিয়া যাইবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাব অন্তত এই ক্ষেত্রে মিলে নাই। ভারতীয় সংবিধানটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিতে পাইতেন, সংবিধান রাজ্যপালকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছে। রাজ্যপাল যেমন মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দিতে পারেন, তেমনই রাজ্য ও জনগণের কল্যাণকল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে পারেন। সংবিধান ইহাও বলিয়াছে, পরিস্থিতি বিচার করিয়া সরকারকে বরখাস্ত করার ক্ষমতাও রাজ্যপালের রহিয়াছে। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের ডাকিয়া প্রসাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ লইবার অধিকারও রাজ্যপালের রহিয়াছে। কাজেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য সরকারের আধিকারিকেরা যখন রাজ্যপালের বৈঠক বয়কট করিয়া থাকেন, তখন তাহারাই সংবিধান বিরোধিতা করিয়া থাকেন, রাজ্যপাল করেন না। রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করিবার পর হইতে এই পর্যন্ত রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর যাহা কিছু করিয়াছেন, একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে—সবটাই তিনি করিয়াছেন সংবিধানের গণ্ডির ভিতর থাকিয়াই। সংবিধানের গণ্ডি তিনি কখনো লঙ্ঘন করেন নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কের ভিতর তিক্ততা আসা কাম্য নহে। রাজ্যপাল রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ। সেই পদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ অনুযায়ী প্রশাসনে কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটিলে বা রাজ্যে কোথাও অরাজকতা দেখা দিলে রাজ্যপাল উদ্বেগ প্রকাশ করিতেই পারেন। প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করিতেও পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক রাজ্যপালের ভূমিকাকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহার প্রতি বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা। তাহা না করিয়া রাজ্যপালকে লক্ষ্য করিয়া হুঙ্কার ছাড়িলে বলিতেই হয়—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকেই অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার এই আচরণ গণতন্ত্রের পক্ষে অশনি সংকেত।

## সুভাষিতম্

*নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্‌বজ্জীবিমতিশয়চপলম্।*

*বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানপ্রস্তং লোক শোকহতং চ সমস্তম্।।*

***এই জীবন পদ্মপত্রের ওপর জলবিন্দুর মতো অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী। এটা জেনেও সমস্ত পৃথিবী রোগ, অহংকার ও দুঃখের মধ্যে ডুবে রয়েছে।***

# এন আর সি হবেই : 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'উদ্বাস্তু'র পার্থক্যটা বোঝা দরকার

বিশ্বামিত্র-র কলম

বাঙ্গলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এবার বিজেপির ফল বেশ খারাপ, গত বিধানসভার নিরিখে না হলেও কিছুদিন আগের লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই। শত হলেও গত বিধানসভায় বিজেপির প্রায় অবিশ্বাস্য ভাবে জেতা খড়্গপুর (সদর) কেন্দ্র এবার উপনির্বাচনে হাতছাড়া হয়েছে। লোকসভায় কালিয়াগঞ্জের বিজেপি এগিয়ে ছিল প্রায় ৫৭ হাজার ভোটে, হার হলো সেখানেও। করিমপুরে ধর্মভিত্তিক ভোটের মেরুকরণ সংখ্যাগত কারণে বিজেপির বিরুদ্ধে গিয়েছে। যাই হোক, হারের কারণ হিসাবে মূলত দায়ী করা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ (এনআরসি) নিয়ে বিজেপির আপোশহীন মনোভাবকে। এর মধ্যে কালিয়াগঞ্জ-করিমপুরের ভোটারদের এন আর সি-র বিষয় নিয়ে মাথাব্যথা থাকতে পারে, কারণ এগুলি সীমান্ত-ঘেঁষা এলাকা। কিন্তু বহু ভাষাভাষীর বসস্থান 'মিনি ভারতবর্ষ' খড়্গপুরের ভোটাররা খামোকা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন কেন? রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ সঠিকভাবেই যুক্তি দিয়েছেন এন আর সি উপনির্বাচনে বিজেপির ভোট বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ হলে খড়্গপুরের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। সুতরাং এবার উপনির্বাচনে বিজেপির ভোট বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হিসাবে এন আর সি-কে দায়ী করা চলে না।

এই বিষয়টা আমাদেরও বুঝতে হবে। এন আর সি নিয়ে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মাথাব্যথা থাকতে পারে, অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন, এমন মুষড়ে পড়া মানুষের চিন্তা হতে পারে, সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীর এন আর সি নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা থাকার কারণ নেই। এটা ঠিক বিরোধীদের এন আর সি নিয়ে প্রচার-কৌশলের সঙ্গে বিজেপি লড়াই করতে পারেনি, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে। এখানে এন আর সি বিরোধিতা সর্বাত্মক, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোই নয় কায়েমী স্বার্থে কিছু প্রচারমাধ্যমও এনিয়ে উস্কানি দিচ্ছে। একটা বিষয় সবার জানা দরকার অসমে এন আর সি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে এবং এনিয়ে যে প্রশাসনিক উদ্যোগ অসমে এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে তাতে 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'উদ্বাস্তু' চিহ্নিতকরণের কোনো মেকানিজম নেই, আর এতেই নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে ও বিরোধীরা অপপ্রচারের সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। রাষ্টসঙ্ঘ 'অনুপ্রবেশকারী' আর 'উদ্বাস্তু'দের সংজ্ঞা আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে যা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। 'অনুপ্রবেশকারী' তাদেরই বলে যারা শুধুমাত্র আর্থিক কারণে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসে, 'উদ্বাস্তু' হল তারা যারা সামাজিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে সীমান্ত পেরোতে বাধ্য হয়। 'আর্থিক কারণটা এক্ষেত্রে গৌণ বা অনুপস্থিত। অন্যদিকে 'অনুপ্রবেশকারী'রা সামাজিক বা ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার হন না কখনোই।

এই হিসাবে দেখতে পেলে বাংলাদেশি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে উৎপীড়নের কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং তাদের উৎপীড়নের শিকার হয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা সেদেশ থেকে উৎখাত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আর এরাজ্য তথা দেশের অর্থনীতিকে বেহাল করার আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবে সীমান্তবর্তী এলাকায় মুসলমানদের অনুপ্রবেশ করানোর পরিকল্পনা বহুদিনের। সুতরাং একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে 'অনুপ্রবেশকারী' বলতে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই বোঝায়, আর উদ্বাস্তু হলো মূলত হিন্দু ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু, প্রতিবেশী ইসলামি দেশের নিরিখে। অর্থাৎ হিন্দু ও অন্যান্যদের যেমন কোনওভাবেই 'অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দেওয়া চলে না, তেমন মুসলমানরাও 'উদ্বাস্তু' হিসেবে কোনোদিনই গণ্য হবেন না। এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই, আছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'অনুপ্রবেশকারী' ও 'উদ্বাস্তু' বিষয়ে নির্ধারক সংজ্ঞা এবং উপমহাদেশের ধর্মীয় আবহ যা নেহরু-জিন্না-মাউন্টব্যাটেন দ্বারা চিত্রিত ও কমিউনিস্ট দ্বারা প্রবল সমর্থিত।

এবার আসল কথায় আসা যাক। এই মাপকাঠিতেই আগামী দিনে এন আর সি হবে, তার আগে আসবে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বা সি এ বি (ক্যাব) অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। যেখানে প্রতিবেশী ইসলামি রাষ্ট্রে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে পালিয়ে আসা সকল মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, যাদের মধ্যে একজনও মুসলমান থাকবে না। আর অনুপ্রবেশকারী হিসাবে যাদের তাড়ানো হবে তারা ভারতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে এরাজ্যে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে, এদের সকলেই হবেন মুসলমান। এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই, আছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট একথা বলেছেন। আফগানিস্তান থেকে আগত সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। অসমের এন আর সি তালিকায় সকল প্রকারের হিন্দুদের যুক্ত করার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হবে 'ক্যাব' এলে।

সুতরাং 'বিজেপি বাঙ্গালি তাড়াচ্ছে' বলে যাঁরা রাজনীতি করছেন এতকাল অনুপ্রবেশকারীদের মদতেই তারা রাজনীতির ময়দানে টিকে আছেন। আপামর হিন্দু বাঙ্গালি যদিও এদের স্বরূপ ধরে ফেলেছেন, তবে যারা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন তাদের সংশয় নিরসন করাটাও বিজেপির কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। ■

# গো-হার বিজেপির, একুশ কি পাক্কা দিদির

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

গা গরমের ম্যাচ ছিল বাঙ্গলায়। অনুশীলন ম্যাচও বলতে পারেন। তাতে তিন-শূন্যের ব্যবধানে বিজেপির মতো প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়ার মধ্যে অবশ্যই মহানাটকীয় ব্যাপার রয়েছে। বিশেষ করে এমন দুই আসনে জিতে যাওয়া, যে দুটি ১৬ সালের ভোটে একা দুশো পেরিয়েও ছুঁতে পারেননি দিদি। এমনকী এবারও খেলার আগে সেখানে জেতার ব্যাপারে কোনও রকমই আত্মবিশ্বাস ছিল না তৃণমূলের। শুধু আশা ছিল, লোকসভা ভোটের তুলনায় খড়্গপুর, কালিয়াগঞ্জে হারের ব্যবধান নিশ্চয়ই কমানো যাবে।

সুতরাং তৃণমূল এখন আবির খেলবে, আনন্দ করবে সেটাই স্বাভাবিক। লোকসভা ভোটে বিজেপির কাছে ১৮টি আসনে হেরে যাওয়ার পরে যাঁরা মনোবল হারিয়ে গর্তে ঢুকে গিয়েছিলেন, তাঁরাও বেরিয়ে আসার সাহস পাবেন।

কিন্তু এখন মূল প্রশ্ন একটাই— একুশে কি ফিরে আসা পাকা তাহলে?

শুধু রাজনীতির লোকেরা কেন, গোটা বাঙ্গলার কাছেও কৌতূহল এখন সেটাই। জবাবে এক কথায় বলা যায়, না। তা বলা যাবে না। এই অনুশীলন ম্যাচ দিয়েই একুশের ফাইনালের বিচার করা যাবে না। কেন যাবে না তার অন্তত দশ রকম কারণ দেখানো যায়।

প্রথমত, রাজনীতিতে কোনওটাই নিত্য নয়। সবই অনিত্য। মাত্র ছ'মাসের ফারাকে কী রকম আসমান-জমিন ফারাক হতে পারে, বৃহস্পতিবারের ফলই তা হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছে। কালিয়াগঞ্জে ৫২ হাজারের লিড মুছে গিয়ে হেরেছে বিজেপি। আবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের খাসতালুক খড়্গপুরে ৪৫ হাজারের ব্যবধান মুছে দিয়ে ২০ হাজারে জিতেছে তৃণমূল। একুশের ভোট আসতে আসতে আরও প্রায় সওয়া বছর। তত দিনে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, তা নিশ্চিত করে বলা এখনই কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

এমনিতে উপনির্বাচনের সাধারণ শর্তই হলো রাজ্যে শাসক দল সাধারণত হারে না। কারণ এ ধরনের উপনির্বাচনে একে তো সরকার বদলে দেওয়ার ব্যাপার থাকে না। তাছাড়া রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে পুলিশ প্রশাসনের থেকে কিছু সুবিধা পেয়েই থাকে শাসক দল।

তবে বিজেপির অতীতের কথাও মনে রাখা উচিত। লোকসভা ভোটে ১৮টি আসন জিতে যাওয়া মানেই বাঙ্গলা দখল করে নেওয়া নয়। ভুলে গেলে চলবে না ১৯৮৪ সালে লোকসভা ভোটে বাঙ্গলায় ৪২টি আসনের মধ্যে ১৬টিতে জিতেছিল কংগ্রেস। তখন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিরা ধরেই নিয়েছিলেন, বাঙ্গলায় পরিবর্তন হলো বলে! কিন্তু ১৯৮৭ সালের বিধানসভা ভোটে দেখা যায় টেনেটুনে ৪০টি আসনে জিতেছে কংগ্রেস। ফলে তিন আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে বিজেপির শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছুই রয়েছে।

একই ভাবে শিক্ষা নেওয়ার রয়েছে তৃণমূলেরও। এই তিন আসেন জিতে তৃণমূল যদি ফের আত্মতুষ্টিতে ভুগতে শুরু করে, তাহলেও হিতে বিপরীত হতে পারে। কারণ, তিন আসনে হেরেই নরেন্দ্র মোদী- অমিত শাহ হতাশ হয়ে বাঙ্গলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন এমনটা তাঁদের অভিধানে নেই। বরং একুশের ভোটের আগে এবার হয়তো বাঙ্গলায় আরও বেশি নজর দেবেন তাঁরা।

দ্বিতীয়ত, উপনির্বাচনে তিন আসনে জিতে যাওয়া মানেই এলাকার মানুষের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূলের নেতাদের বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে গিয়েছে, তা নয়। কারণ, জেলায় জেলায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এলাকায় ভরপুর ক্ষোভ রয়েছে। তাছাড়া একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াও রয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। তা রাতারাতি উবে যাবে তাও হয়তো নয়।

আবার এই ফলাফল আলাদিনের প্রদীপের মতো পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূলের কোন্দলও থামাতে পারবে না। উল্টে আরও একবার ক্ষমতায় আসছিই ধরে নিয়ে তা বেড়ে যেতে পারে। আর সেই লম্ফঝম্প আস্ফালন দেখলে বীতশ্রদ্ধ হতে পারেন মানুষ।

**—সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

# পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন জিততে শুধু মোদী-অমিত শাহের ম্যাজিক নির্ভরতা কমাতে হবে

সাম্প্রতিক তিনটি উপনির্বাচনের ফলাফল দেখাল কেন্দ্র সরকার নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের তালমিল খুঁজতে যাওয়ায় বৃথা। কয়েক বছর ধরে সারা ভারতেই এই প্রবণতা নজরে পড়ছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিসগড় তিনটি রাজ্যের ভোটদাতাদের যে দলীয় পছন্দ ছিল কয়েকমাস পরের লোকসভা নির্বাচনে তা আমূল বদলে যায়। বিধানসভায় কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলেও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় হয়। এই বিষয়টা মাথায় রাখলে তিনটি বিধানসভাতেই তৃণমূল দলের বড়ো জয় হলেও তা অভূতপূর্ব এমনটা নয়।

এমনকী উপনির্বাচনের ফলাফল বহুক্ষেত্রেই বড়ো প্রেক্ষাপটে গিয়ে পড়লে অনেক সময়ই তার পুনরাবৃত্তি হয় না। ২০১৮ সালেরই লোকসভা নির্বাচনের ৬ মাস আগে সমাজবাদী ও বহুজন সমাজবাদী দলের জোট উত্তরপ্রদেশে বিজেপিকে হারানোর পরই হাওয়া উঠে যায় কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের নতমস্তকে বিদায় আসন্ন। বিরোধীরা নতুন নতুন জোটে আগ্রহী হয়ে ওঠে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এই ধরনের চিন্তাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে। তবে কেবলমাত্র অতীত কিছু পরিসংখ্যান ও ট্রেন্ডের উদাহরণের ভিত্তিতে মমতা ব্যানার্জির এই সাফল্যকে আদৌ খাটো করে দেখা যায় না ও উচিতও নয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মানুষের ভোট দেওয়ার গতিমুখকে এই নির্বাচনে সম্পূর্ণ তাঁর স্বপক্ষে নিয়ে আসার কৃতিত্ব তাঁরই। সে সময় তৃণমূল কংগ্রেসের বড়োসড়ো ক্ষতি হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনৈতিকভাবে একটি অতি সংবেদনশীল ও সচেতন রাজ্যে কী লোকসভার ভোট কী স্থানীয় পঞ্চায়েতের নির্বাচন প্রতিটিতেই মানুষের উত্তেজনা থাকে তুঙ্গে, আর ফলাফলকে নিয়ে চলে চুলচেরা বিচার। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রাজ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে মমতা সরকারের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিদায় নিশ্চিত। বিজেপিই পর্দার পেছনে শূন্যস্থান পূরণ করতে অপেক্ষমান। সময় এলেই দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বিশেষ করে দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে লোকসভার সময়কার বিজেপির বিশাল ব্যবধানকে হেলায় মুছে দিয়ে জয় হাসিল করা প্রমাণ করছে মমতার এখনও পর্যাপ্ত রাজনৈতিক গোলাবারুদ যা রয়ে গেছে তা দিয়ে যে কোনো লড়াইয়ে ফিরে আসা যায়। অবশ্যই বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ২০২১-এর মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তার মধ্যেই এই ফলাফল বোঝাল যে তিনি লোকসভার ফলাফল পরবর্তী হতচকিত অবস্থা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। গত ছ' মাসে পশ্চিমবঙ্গবাসী কিছুটা নিস্তেজ ও চরিত্রবহির্ভূতভাবে চুপচাপ একজন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছিল। তিনটি উপনির্বাচনের বড়ো জয় তাকে আবার চরম আক্রমণাত্মকভাবে ফিরিয়ে আনবে বলেই ধরে নেওয়া যায়।

> “জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নিয়ে বিজেপি'র অবস্থান ও তৎপরতাকে মমতা ব্যানার্জি অত্যন্ত চতুরভাবে লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার, ঘর হারানোর, নাগরিকত্ব হারানোর উদ্বেগ সৃষ্টিতে তুমুলভাবে সফল হয়েছেন।”

ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হানাহানি আর হিংসা যা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিশিষ্ট অবস্থান করে নিয়েছে তা যে কোনো মুহূর্তে বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলাগুলি থেকে খবর আসতে শুরু করেছে বিজয়ী তৃণমূল কর্মীরা উজ্জীবিত হয়ে সদ্য পরাজয়ের ফলে কিছুটা ম্রিয়মাণ বিজেপি কর্মীদের ওপর হিংস্মাতক প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করছে।

ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটা জিনিস পরিষ্কার উঠে এসেছে যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নিয়ে বিজেপি'র অবস্থান ও তৎপরতাকে মমতা ব্যানার্জি অত্যন্ত চতুরভাবে লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার, ঘর হারানোর, নাগরিকত্ব হারানোর উদ্বেগ সৃষ্টিতে তুমুলভাবে সফল হয়েছেন। বিজেপি যখন বোঝাচ্ছে লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধন বিল পাশ হলেই জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর কাজে হাত দেওয়া হবে। এর ফলে হিন্দু শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। মমতা তখন সুপ্রিম কোর্টের

নির্দেশে অসমে এনআরসি চালু করার ফলে কেবলমাত্র মুসলমানরা নয় হিন্দুরাও অসমে তালিকা থেকে বাদ পড়ে নিজের দেশেই উদ্বাস্তু হয়ে গেছেন ঘোষণা করে তুমুল আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করেন। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে গোর্খা, রাজবংশীরাও রয়েছেন জানিয়ে তিনি উত্তরদিনাজপুর অঞ্চলে নিশ্চিত ফল পেয়েছেন।

অসমে এনআরসি তৈরির ক্ষেত্রে প্রচুর ভুলত্রুটি হয়েছে। তার সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ চললেও মমতা ব্যানার্জি বলেছেন এখানেও ওই একই ঘটনা ঘটবে। হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পড়বেন। তিনি এখানে এনআরসি কিছুতেই হতে দেবেন না। হিন্দুদের মধ্যে এই চাপা অথচ চরিত্রগতভাবে আতঙ্কজনক প্রচারের পরিণতিতে লোকসভা ভোটে যে হিন্দুরা বিজেপিকে সমর্থন করেছিল তাদের মধ্যে একটি বিশাল অংশ মমতা দিকে সরে গেছে তার হিসাব করাই দুষ্কর। ভোটের নির্ণায়ক মাত্রার এই দোলাচল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে রাজ্যে এনআরসি করতে না দেওয়া নিয়ে মমতার বিধ্বংসী প্রচার মানুষ বিশ্বাস করেছে। এর বিপরীতে এনআরসি ও সিএবি-র সদর্থক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিজেপি কোনো পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে উঠতে পারেনি। ভবিষ্যতে এনআরসি হবেই স্থানীয় নেতাদের এই নিয়ে নিরন্তর প্রচার বিজেপিকে মমতার জালেই ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ প্রান্তে বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত দল হলেও পশ্চিমবঙ্গে বড়ো সংখ্যার নাগরিকদের দল হওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি এখনও তুলনামূলকভাবে নতুন। বস্তুত ২০১৪ সালের আগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দলের বিরাট সাফল্যের কিছুটা প্রতিফলিত গৌরবের ভাগীদার হিসেবেই ছিল পশ্চিমবঙ্গে দলের পরিচিতি। অনেকটাই যেন মূল রাজনীতি বৃত্তের বাইরের পরিসরে থাকা। সর্বভারতীয় বড়ো বড়ো নেতারা রাজ্যে এলে তাদের সন্তোষজনকভাবে আপ্যায়ন করা ও যথাযথ আতিথেয়তায় যাতে ত্রুটি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই ছিল দলের প্রধান কর্তব্য। এমন পরিস্থিতি আমূল পালটে গেছে। এগুলি আর আদৌ বাস্তব নয়। দলের মধ্যে চলছে তীব্র দ্বন্দ্ব। এক শ্রেণী ভাবছে এটি একটি ছোট কিন্তু দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ অরাজনৈতিক সংগঠন অন্য এক শ্রেণী যারা মমতার মতো নিজেকে তুলে ধরে রাজনীতির আলো শুষে নেওয়ায় বিশ্বাসী তারা এর বিরুদ্ধে লেগে পড়েছে। এই মতবিরোধের আদৌ সমাধান হয়নি। আর স্থানীয় কোনো উপযুক্ত নেতার অভাবে কেন্দ্রের বড়ো বড়ো নেতাদের মাথা ঘামানোর ওপর অতিগুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এরই পরিণতিতে বিজেপির চিরাচরিত তকমা—বাঙ্গালির চিন্তা চরিত্র সংস্কৃতির সঙ্গে দল খাপ খায় না—এই মানসিকতাটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এগুলির কোনোটিই কিন্তু অপ্রতিরোধ্য কোনো সমস্যা এমন নয়। কিন্তু এটিকে কাটিয়ে উঠতে দরকার জাতীয় রাজনীতির গতিমুখের সঙ্গে প্রাদেশিক রাজনীতির সফল মিশ্রণ। বিগত লোকসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি একটি জগাখিচুড়ি চরিত্রের জাতীয় দৃষ্টিকোণ নিয়েছিলেন। যেখানে সকলে মিলে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেবে। এটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

অন্যভাবে, বিজেপি যদি সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে মোদী-অমিত শাহ্ দিয়ে বিধানসভা বৈতরণী পেরোতে চায় তাহলে ভুরাডুবি হবে। এই প্রক্রিয়া মমতা ব্যানার্জির হাতে কেক তুলে দেওয়ার মতোই হঠকারী। কেননা তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নির্মম রাজনীতিবিদ যিনি স্থানীয় স্তরের মেঠো দাগের রাজনীতির পাকা খেলোয়াড়।

পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু উদ্ভাবনী রাজনীতির গবেষণাগার হয়ে ওঠার সম্ভবনা রাখে যা দাদা বা গুন্ডানির্ভর রাজনীতির পরিসরের বাইরে। কিন্তু তা করতে গেলে সব ধরনের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ছাঁচ ভেঙে ফেলতে হবে।

*(লেখক রাজ্যসভার সদস্য)*


*রাষ্ট্রায় স্বাহা, রাষ্ট্রায় ইদং ন মম*

## আহ্বান : দেশের জন্য এক বছর সময় দান করুন

জমিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহারের কারণে চাষে ক্ষতি হচ্ছে, যার ফলে চাষিভাইরা চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন। এইসব কৃষিপণ্যের ফলে মানুষ বিভিন্নভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। গ্রামে রোজগারের অভাবে মানুষ শহরের দিকে পলায়ন করছে। গো-পালন ছেড়ে দেওয়াতে গো-বংশ কসাইয়ের হাতে চলে যাচ্ছে।

চাষিদের এবং গো-বংশকে এই গভীর সংকটময় অবস্থা থেকে রক্ষা করলেই গ্রাম ও দেশ রক্ষা হবে। এর জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষিদের গো-ভিত্তিক চাষ ও গো-ভিত্তিক জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করাতে হবে। এতে গোরুর দ্বারা চাষির রক্ষা হবে ও চাষির দ্বারা গোরুর রক্ষা হবে। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করার পথ।

**পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে এই জ্ঞান-আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রেমী, গো-প্রেমী, সেবা-ভাবী যুবক-যুবতীদের আহ্বান করা হচ্ছে, যারা বাড়ি ছেড়ে ন্যূনতম এক বছর সময় এই মহৎ কাজের জন্য দান করবেন।**

এই বিষয়ে পথনির্দেশ, প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সংস্থার দ্বারা করা হবে। বয়সসীমা ৩৫-৫০ বছর।

লিখিত আবেদন নিম্ন ঠিকানা বা ই-মেলে পাঠাতে পারেন—

**গো-সেবা পরিবার**

৫২৪-বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৩

E-mail : gosevaparivar@gmail.com

www.gosevaparivar.org

## রম্যরচনা

# শাশুড়ি বৌমা সংবাদ

বৌমা কাঁদতে কাঁদতে এসে শাশুড়িকে বলল— মা, আমার মুখটা কি আমড়া আঁটির মতো।

শাশুড়ি— না তো। তোমার মুখ তো লক্ষ্মীপানা।

বৌমা— আমার গায়ের রং কি আলকাতারা?

শাশুড়ি— না, না, তোমার তো দুধে আলতা গায়ের রং।

বৌমা— আমার গলার আওয়াজ কি কাকের ডাকের মতো?

শাশুড়ি— ছি, ছি, কে বলেছে একথা? তুমি তো কোকিলের মতো সুকণ্ঠী।

বৌমা— আমি কি ধুমসি, মোটা, কুমড়ো পটাশ?

শাশুড়ি— তা কেন? তুমি তো ছিপছিপে, তন্বী।

বৌমা— তাহলে সবাই বলে কেন, আমি আপনার মতো দেখতে?

শাশুড়ি— আ, মর মুখপুড়ি।

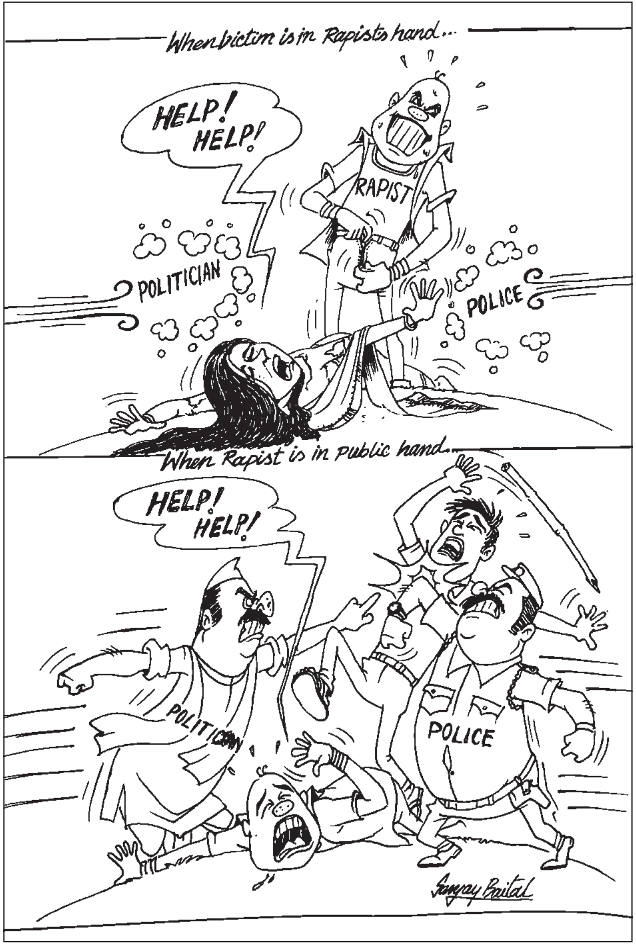


## উবাচ

“অসমের এনআরসি থেকে যাদের নাম বাদ গেছে, তারা কি রাহুল গান্ধীর খুড়তুতো ভাই? না হলে রাহুলবাবা কেন বলছেন এনআরসি ছুটদের বের করে দেওয়া যাবে না? ওরা কোথায় যাবেন, কী খাবেন নিয়ে রাহুলবাবার এত চিন্তা কেন?”

**অমিত শাহ**
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

***ঝাড়খণ্ডে এক নির্বাচনী সভায়***

“মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে টাকা দাবি করেছেন সেটা মানুষের কাছে আদৌ পৌঁছবে কিনা আগে জানা দরকার। ত্রাণের টাকা একুশের ইলেকশনে খরচ হবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে!”

**দেবশ্রী চৌধুরী**
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

***মমতার ত্রাণের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে***

“যারা এই ধরনের বীভৎস ঘটনা ঘটায় তাদের কঠোর শাস্তি দিতে আইন আরও নির্দয় করা যায় কিনা সে বিষয়ে সংসদে আলোচনা করতে আমরা রাজি আছি।”

**রাজনাথ সিংহ**
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

***হায়দরাবাদে প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির গণধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে***

“ওই কংগ্রেস নেতার কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ‘মানসিক ভারসাম্য’ হারিয়েছেন। ওঁর এখনই জরুরি চিকিৎসা দরকার।”

**জি ভি এল নরসিংহ রাও**
বিজেপি নেতা

***নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে অধীররঞ্জন চৌধুরীর ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলা প্রসঙ্গে***

# রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার হাতের পুতুল নন

**ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত**

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদলের কিছু মন্ত্রী-নেতার সম্পর্ক বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছে! রাজ্যপালের কিছু মন্তব্য ও কাজ তাঁদের পছন্দ হয়নি, সেই কারণে তাঁরা তারস্বরে তাঁর নিন্দা করে চলেছেন। 'অতি সক্রিয়তা', 'সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘন', 'সমান্তরাল শাসন চালু' ইত্যাদির নানা অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অভিযোগগুলো যুক্তিপূর্ণ কিনা, সেটা বোঝার জন্য আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থাটা বুঝতে হবে। তার জন্য দরকার সংবিধান গ্রন্থের মলাট ওলটানো।

এটা লক্ষণীয় যে, রাজ্যপাল কোনো কোনো সময়ে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শাসকদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বিরোধী দলের বিশেষত বিজেপি-কর্মীদের গণ্ডগোল চলছে। আজও সেটা বন্ধ করা যায়নি। রাজ্যের মুখ্য শাসক হিসেবে রাজ্যপাল এই নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারেন। সেটা স্পষ্টতই তাঁর সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধান তাঁকে মূক, বধির ও অন্ধ হয়ে থাকতে আদৌ বলেনি। সংবিধানের ১৫৪ (১) নং অনুচ্ছেদ জানিয়েছে— 'The executive power shall be vested in the Governor and shall be excercised by him either directly or through officers subordinate to him।' তবে আমরা ব্রিটেনের Westmsintar model গ্রহণ করায় সাধারণত মন্ত্রীসভাই রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন--- রাজ্যপাল নেন উপদেষ্টার ভূমিকা।

তাবলে তিনি কথা বলতে পারবেন না? তাঁকে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে?

বিজেপি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়েই গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আটক করে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। রাজ্যপালকে তিনি সেটা জানালে রাজ্যপাল ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

তাতেও শাসকদলের অনেকে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাদের বক্তব্য ছিল, রাজ্যপালের সেখানে যাওয়াটা উচিত কাজ হয়নি। তার মানে এমন অরাজকতা চলাই উচিত ছিল? রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের কাজ তাহলে কী? রাজ্যপাল তাই প্রশ্ন তুলেছেন--- রাজ্য-শাসকদের কাজটা সেক্ষেত্রে কি? ড. এস সি কাশ্যপ মন্তব্য করেছেন, 'There are certain areas where the Governor may have to use his own wisdom'— (আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২১৫)। মন্ত্রীসভার ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তিনি অবশ্যই সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করতে এবং পরামর্শ দিতে পারেন।

> ক্ষমতার মোহে মন্ত্রী-নেতাদের অনেকেই মনে করেন, রাজ্যপাল তাঁর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে চলেছেন। অবশ্যই পরিস্থিতি অনুসারে রাজ্যপাল তাঁর নেপথ্য-বাস ছেড়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতেই পারেন।

মনে রাখতে হবে— শপথ গ্রহণে তিনি ঈশ্বরের নামে ('in the name of God') অথবা বিবেকের কাছে ('solemnly affirm') জানান যে তিনি সংবিধানকে বা আইনকে রক্ষা করবেন এবং জনগণের কল্যাণের দিকটা ('wellbeing') দেখবেন। অন্ধভাবে তিনি শাসকদের ক্রীতদাস হয়ে থাকবেন— এটা তিনি কখনও বলেন না।

সুতরাং তিনি যদি মনে করেন, কোনও ব্যাপারে সংবিধান, আইন বা জনকল্যাণের জন্য তাঁর কিছু বলা বা করা উচিত, তাহলে তিনি তাঁর পরামর্শ দিতেই পারেন— এটাকে অতি-সক্রিয়তা বা কেন্দ্রের হয়ে কাজ করা বলে না।

মাস দুয়েক আগে তিনি শিলিগুড়ি থেকে জেলা সফর শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে শাসকদলের কোনও জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন— তাতে প্রশাসনিক আধিকারিকরাও আসেননি কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার কারণে।

কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মন্ত্রীরা তাঁর অধীনস্থ কর্মী (শিবনাথ বনাম সম্রাট— প্রিভি কাউন্সিল) অফিসার ও কর্মীরাও তাই। কর্ণধারদের বক্তব্য ছিল--- রাজ্যপাল অনুমতি নেননি। আশ্চর্য যুক্তি একটা— রাজ্যপাল তো ইচ্ছেমতো রাজ্যের যে-কোনও স্থানে যেতে পারেন। তিনি ইচ্ছেমতো কোনও অফিসারকে ডেকে তথ্য জানতে চাইতেও পারেন। তিনি বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে যোগ দেওয়ার পর স্থানীয় বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন। এতেও অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আচ্ছা, সংবিধানের দু-চারটে পৃষ্ঠা পড়ে দেখা কি অসম্ভব ব্যাপার?

১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদে কী আছে— সেটা কয়'জনে জানে? বলা হয়েছে--- রাজ্যপাল যেসব ক্ষেত্রে তাঁর 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগ করবেন না, সেইসব ক্ষেত্রেই

মন্ত্রীসভা তাঁকে সাহায্য করবে ও পরামর্শ দেবে। তাহলে বলতেই হবে যে, রাজ্যপালের কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে। কিন্তু কোনগুলো এই 'discretionary power', সেটা সংবিধান জানায়নি, বরং ১৬৩ (২) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সেটা নির্ধারণ করার ভার রাজ্যপালের ওপরেই দেওয়া হয়েছে। যার হাতে এই ধরনের অনির্দিষ্ট স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকে, তাঁকে ক্যাবিনেটের হাতের পুতুল বলা যায় কি?

তাছাড়া এটাও বলা যায় না যে, তিনি ক্যাবিনেটের সব পরামর্শ ও সাহায্য (aid and advice) মেনে নিতে বাধ্য। কেন্দ্রেও রাষ্ট্রপতি- মন্ত্রীসভার সম্পর্কটা এমনই ছিল ৭৪ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে। তিনি ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪৬তম সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা আনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শ শুনতে এখন বাধ্য— এখন তিনি অনেকটা 'rubber stamp।'

কিন্তু রাজ্যস্তরে তেমন কিছু হয়নি। তাহলে তাঁকে রাজভবনের ঘুমন্ত শাসক বলা যায় কী করে? এই জন্যই ড. বি.সি. রাউত লিখেছেন, 'The Governor is not a mere figurehead'— (ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২২২)। আর এম.ভি. পাইলি মন্তব্য করেছেন, রাজ্য শাসনে রাজ্যপাল একটা 'vital role' নিতে পারেন— তিনি আদৌ এক নিষ্ক্রিয় শাসক নন--- (অ্যান ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কনস্টিটিউশান, পৃ. ২০৪)।

এটা মনে রাখতে হবে যে, ১৯৫৯ সালে কেরলের রাজ্যপাল মন্ত্রীসভা আনিত 'কেরল এডুকেশন বিল'-এর একটা অংশ নিয়ে আপত্তির কারণে সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সন্দেহ যুক্তিপূর্ণ বলেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং কলকাতা হাইকোর্ট সেটাকে বৈধ বলেই রায় দিয়েছিল (শর্মা বনাম ঘোষ)। ১৯৬৯ সালে তিনি মন্ত্রীসভা লিখিত অভিভাষণের দুটো অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পড়েছিলেন সঙ্গত কারণেই। কোনো দল বা গোষ্ঠী একক গরিষ্ঠতা না পেলে রাজ্যপাল মন্ত্রীসভা গঠনে সক্রিয় ভূমিকাও নিতে পারেন— (জি.এস. পাণ্ডে— কনস্টিটিউশানাল ল' অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪০)। একবার মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল বিধানসভার ভাষণ দেওয়ার সময় জনৈক সদস্যকে বহিষ্কৃত করেছিলেন অভব্যতার কারণে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর দলে বা কোয়ালিশন সরকারে ভাঙন দেখা দিলে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে মুখ্যমন্ত্রীকে আস্থা প্রমাণের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন, কারণ তাঁকে দেখতে হবে— তাঁর সরকারের গরিষ্ঠতা আছে।

আরও বড়ো কথা হলো--- কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতিকে সরানোর জন্য মন্ত্রীসভা সংসদে 'ইম্‌পিচমেন্ট'-প্রস্তাব আনতে পারে (৬১ নং অনুচ্ছেদ) তাতে অন্তত দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন। কিন্তু রাজ্যপালের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই--- রাষ্ট্রপতির হাতেই রয়েছে এই ক্ষমতা। কিন্তু রাজ্যপাল মন্ত্রীদের সরিয়ে দিতে পারেন, কারণ ১৬৪ (১) নং অনুচ্ছেদে আছে— 'Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor।' অবশ্য সংসদীয় ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া রাজ্যপাল কোনও মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে সরাতে গেলে তিনি সেটা সরাসরি করতে পারেন, কারণ মুখ্যমন্ত্রীও একজন 'Minister।'

এই সব কারণে ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'The Governor is not a sipher'--- (ইন্ডিয়া, ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৭৪)

একটা কথা মনে রাখতেই হবে, মুখ্য রচয়িতা ড. বি. আর. আম্বেদকর সংবিধানের শেষে 'Instrument of institutions' নামে একটা অধ্যায় রাখতে চেয়েছিলেন— তাতে ছিল রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল কোন পরিস্থিতিতে কী করবেন। সেটা থাকলে তাঁদের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু সেটা পরে বাদ গেছে। এই সব কারণে এস. এল. সিক্রি লিখেছেন, পদটা আদৌ 'decorative emblem' নয়— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৩৬)। ড. বিদ্যাধর মহাজনও এই বিষয়ে একমত। তাঁর ভাষায়— রাজ্যপাল 'is an essential part of the constitutional machinery'— (দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৮২)।

অবশ্য আমি যেমন সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা নই, তেমনি মন্ত্রী-নেতারাও নন। কাজটা উচ্চ আদালতের। তবে আপাতত মনে হয়, ক্ষমতার মোহে তাঁদের অনেকেই মনে করেন, রাজ্যপাল তাঁর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে চলেছেন। অবশ্যই পরিস্থিতি অনুসারে রাজ্যপাল তাঁর নেপথ্য-বাস ছেড়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারেন। ▌

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

| | | |
|---|---|---|
| Account Name | : | **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.** |
| A/C. No. | : | **917020084983100** |
| IFSC Code | : | **UTIB0000005** |
| Bank Name | : | **AXIS Bank Ltd.** |
| Branch | : | **Shakespeare Sarani, Kolkata** |

# রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর একজন ‘ধর্মযোদ্ধা’

**সুজিত রায়**

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতে এখনও ঢের দেরি। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের অশনি সঙ্কেতে আতঙ্কিত তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো ‘ত্রাহি ত্রাহি’ আর্তনাদ শুরু করেছেন।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বাড়তি চাপ হয়ে উঠেছে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সাংবিধানিক আচরণ। বাইরে সবুজ ভিতরে লাল তরমুজের মতো বাইরে জনপ্রেমী, ভিতরে একনায়িকা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে মেনে নেওয়াটা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এও এক নতুন চ্যালেঞ্জ। এর আগে কখনও এত বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়নি তাঁকে। কারণ তিনি সংবিধানকে পাশে সরিয়ে রেখে চলতে অভ্যস্ত। আর রাজ্যপাল যিনি কিনা এ রাজ্যের অতিথি— দুদিনের জন্য এসেছেন, দু'দিন পরে চলে যাবেন, তিনি কিনা রাজ্য জুড়ে খবরদারি চালাবেন— এত বড়ো দুঃসাহস!

অতএব, যিনি নিজেকে শুধু রাজ্যের নয়, গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতির একমেবাদ্বিতীয়ম্ মনে করেন, যিনি মনে করেন, তাঁর চেয়ে বড়ো উন্নতিকামী কোনো মুখ্যমন্ত্রী গোটা ভূ-ভারতে নেই, যিনি বিশ্বাস করেন, শুধু বঙ্গবাসী নয়, গোটা ভারতবাসীই তাঁকে ‘ভারতমাতা’ হিসেবে সম্মান করেন, তিনি আর্তনাদ শুরু করেছেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তর্জনী তুলে প্রকাশ্য জনসভায় হুমকি দিচ্ছেন রাজ্যের সাংবিধানিক সর্বাধিনায়ককে--- ‘অধিকারের সীমা ছাড়াবেন না। সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর কোনো এক্তিয়ার আপনার নেই।’ দলের মহাসচিবকে দিয়ে বলাচ্ছেন— পর্যটক হয়ে এসেছেন। রাজ্যের আতিথেয়তা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। আনন্দ করুন। মানুষের কাছে যাবার দরকার কী?

সত্যিই তো ‘মা-মাটি-মানুষ’ স্লোগানটা তো তৃণমূল নেত্রীর তৈরি। পেটেন্ট নেওয়া নেই। তার ওপর একটি বাংলা যাত্রাপালা থেকে টুকলি করা। তাতে কী! ওটা এখন তৃণমূলের সম্পত্তি। তাতে ভাগ বসাবেন রাজ্যপাল? এত সাহস?

তা কী করেছেন রাজ্যপাল?

১। জেলায় জেলায় গেছেন। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের বৈঠক ডেকেছেন।

২। জেলায় জেলায় গেছেন। গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন।

৩। রাস্তাঘাট খারাপ দেখলে প্রকাশ্যে তা মেরামতির প্রয়োজনীয়তার পরামর্শ দিয়েছেন।

৪। পুলিশি প্রশাসনের অপদার্থতার প্রতি আঙুল তুলেছেন।

৫। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঘিরে ধরে একদল যুবক মারধর করতে উদ্যত হলে রাজ্য প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল নিজে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

৬। হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং ত্রুটি সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন।

৭। বুলবুল ঝড়ে বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কতটা শোচনীয় তা রাজ্যের মন্ত্রীসভার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন।

৮। রাজ্যের ঐতিহাসিক স্থানগুলির ইতিহাস জেনে সেগুলির পর্যটন-সম্ভাবনার প্রসঙ্গ তুলেছেন।

৯। রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের সমস্ত ওজর-আপত্তি নস্যাৎ করে দিতে বারবার বিবৃতি দিয়েছেন।

১০। প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, তিনি বিজেপির প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং কেন্দ্রের সরকারের সংসদীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি কিছু অন্যায় করেননি।

অপরাধের পর অপরাধ। ‘নিরপরাধ’ মুখ্যমন্ত্রী সহ্য করবেন কেমন করে! বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার এক নয়া নজির যিনি গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন তিনিই একমাত্র পদাধিকারী, বাকিরা ফিনফিনে ধুতির কোঁচানো কাছা দোলানো মোসাহেবের বেশি কিছু নয়। যেখানে গোটা রাজ্যের মিডিয়াকে তিনি সকাল বিকেল কান ধরে ওঠবোস করাচ্ছেন। যেখানে রাজ্যের গরিব-গুর্বো মানুষগুলোকে কেন্দ্রের ভরতুকির টাকায় দু'টাকা কেজি চাল আর মিড ডে মিলের ‘ডিম ভাত’ খাইয়ে প্রচার করছেন, হাজার অর্থাভাবেও তিনি তাঁর গোটা রাজ্যের কোষাগার তাঁদের জন্য উজাড় করে দিচ্ছেন। যেখানে রাজ্যের যুব সমাজের কোমর ভেঙে দিচ্ছেন বছর বছর ক্লাব প্রতি দু' লক্ষ টাকা করে ঘুষ দিয়ে। যেখানে ‘কাটমানি’কে তিনি প্রশাসনিক চেয়ারে বসেই স্বীকৃতি দিয়ে দলীয় ভাই-বোনদের রাজনীতি নামক ব্যবসাটা শিখিয়ে দিয়েছেন। যেখানে রাজ্য প্রশাসনের

জ্ঞানী-গুণী শিক্ষিত শিক্ষিতা আইএএস, আইপিএস অফিসারদের 'বলদ'-এর বেশি সম্মান দেওয়াটা বাড়াবাড়ি মনে করেন। যেখানে তিনি সবচেয়ে বেশি খড়্গহস্ত শিক্ষক অধ্যাপকদের আর সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক ভাবে বঞ্চনা করতে। যেখানে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের স্থায়ী জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করায় তাঁর তীব্র অনীহা, কারণ তাহলে নাকি তারা আর তাঁর বশংবদ হয়ে থাকবেন না। যেখানে তিনি মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর পোষা চাকর এবং রাজ্যপাল মানে তাঁর ছাত্র। তিনি জ্ঞান দেবেন আর রাজ্যপাল তা চোখ বুজে শুনবেন। কী করে মেনে নেবেন এতগুলি অপরাধ?

স্বপ্নেও ভাবেননি, জগদীপ ধনকরের মতো একটা রাজ্যপাল তাঁকেই শিখিয়ে দেবেন রাজ্যপালের প্রকৃত সাংবিধানিক সংজ্ঞা। অনেকটা সদ্য প্রয়াত দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন সেশনের মতো যিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সাংবিধানিক আচার মেনে না চললে, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের এমনকী শাসক দলের, এমনকী সরকারেরও কোনো অন্যায় আবদার অথবা হুমকি শুনতে বাধ্য নন। রাষ্ট্রের নির্বাচন কমিশনারের পদের প্রকৃত সংজ্ঞা তিনিই প্রথম তুলে ধরেছিলেন দেশবাসীর সামনে। এমনকী সুপ্রিম কোর্টও তাঁর মাথা নত করাতে পারেনি। ভারতীয় ভোটতন্ত্র তথা গণতন্ত্রে তিনি নির্বাচন কমিশনের ইতিহাস একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করে গেছেন। সে সময়ও সরকারি প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা তাঁর ডাকা বৈঠকে আসতেন না। এটা যে হবে, জেনেই তিনি ওই পদে যোগ দিয়েছিলেন কাঞ্চীপুরমের শঙ্করাচার্যের কথায়। যিনি তাঁকে গীতার একটা শ্লোক শুনিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন— ধর্মপালন, ধর্মরক্ষা এবং সত্যের শক্তির চরম মাহাত্ম্য। তাই ধর্মপালন, সত্যপালন এবং ধর্মরক্ষা করার জন্য তাঁর ওই পদে যোগ দিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ধর্মরক্ষা করেছিলেন। সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন— 'আমি সকালের প্রাতরাশ সারি রাজনীতিকদের নিয়ে। কারণ তখন সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিনই রাজনীতিবিদরা তাঁকে মেগালোম্যানিয়াক, পাগল, বুলডগ, খ্যাপা কুকুর, হোলি টেরর বলে সম্বোধন করে বিবৃতি দিতেন। কিন্তু সেশন সাহেব হাল ছাড়েননি। রাজনীতিবিদরা যদি হতেন বুনো ওল, তিনি ছিলেন বাঘা তেঁতুলের ভূমিকায়। এটাকে যদি 'সেশনোম্যানিয়া' বলে গালাগাল করা হয় তাহলেও কিছু যায় আসে না। কারণ তাঁর গোটা প্রচেষ্টাটাই ছিল গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জন্য এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য।

নির্বাচন কমিশনার হওয়ার আগেও সেশন সাহেব তামিলনাড়ুতে জোর করে হিন্দিভাষা চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করে ডিএমকে-র চক্ষুশূল হয়েছিলেন। হরিয়ানায় মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল তাঁকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম জি রামচন্দ্রনও তাঁকে পছন্দ করতেন না। তাতেও সেশন সাহেব পিছু হটেননি। কারণ পিছু হটাটা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরও গত দু' মাসে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য তিনি ধর্মপালনে ব্রতী হয়েছেন। তিনি মানতে নারাজ— মুখ্যমন্ত্রী হেডমিস্ট্রেস আর তিনি জরদগব ছাত্র। তার বেশি তাঁর কোনও ভূমিকা নেই--- তা মানবেন না। কারণ তিনি এর আগে কেন্দ্রীয় পরিষদীয় মন্ত্রীর ভূমিকাও পালন করে এসেছেন। তার ওপর তিনি প্রাক্তন সাংসদ এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। তাঁকে বাগ মানানো এতটা সহজ নয়। আসল সত্যটা হলো, রাজ্যের কসমেটিক উন্নয়নের পিছনে যে গভীর অন্ধকার, রাজ্যপাল সেটাই উদ্ঘাটন করতে চাইছেন। দেখাতে চাইছেন, রাজ্যে হাজারো নতুন কলেজ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিন্তু পরিকাঠামো নেই। তিরিশ শতাংশ শিক্ষকের পদ খালি। চেনাতে চাইছেন, অনেক নতুন হাসপাতাল হয়েছে। সবই নাকি অতি উন্নত মানের। কিন্তু চিকিৎসক নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেল আছে। ওয়ার্ডেন নেই। স্কুলে মিড ডে মিল আছে, মাস্টারমশাই, দিদিমণি নেই। জেলায় পুলিশ আছে। তাদের স্বাধীনতা নেই। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির রাজনীতি করার সাংবিধানিক অধিকার নেই। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা আছে— পথ নেই। মিশন নির্মল বাঙ্গলা আছে অথচ গত দু' মাসে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যুর সংখ্যা ৪৪। রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্প যত ছড়ায়— স্কুল ড্রপ আউটের সংখ্যাও তত বাড়ে।

এসব দেখার অধিকার রাজ্যপালের নেই? এসব বলার অধিকার রাজ্যপালের নেই? মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেবার অধিকার রাজ্যপালের নেই? জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করার অধিকার নেই রাজ্যপালের? যদি না থাকে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যান না সাংবিধানিক আদালতে। সেখানে অভিযোগ করুন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে। শুধু আর্তনাদ করে রাজ্যের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে কী লাভ? রাজ্যপাল রাজ্যকে চিনবেন না? জানবেন না? রাজভবনের জীবন কাটাবেন আলস্যে?

ভুল করছে রাজ্য সরকার। মানুষটাকে চিনতে ভুল করছে। কারণ এই মানুষটাই প্রকাশ্যে বলেছেন— তাঁর অধিকার সম্বন্ধে তিনি যতখানি সচেতন, ঠিক ততখানিই সচেতন তাঁর অধিকারের সীমা সম্পর্কে। সে সীমা তিনি লঙ্ঘন করছেন না। তাই তাঁকে তাঁর পথ থেকে সরানো যাবে না।

মানুষের সবচেয়ে বড়ো গুণ হলো সত্ত্ব গুণ। যুগে যুগে মনীষীরা একথাই বলে গেছেন। নিজেকে চেনা নিজেকে জানা। সততাই হলো জীবনের ভূষণ। তাহলে জীবনে কোনও গ্লানি থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের নতুন মেজাজের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সেই সত্ত্বগুণের অধিকারী বলেই গলা উঁচিয়ে কথা বলতে পারেন। আর কে-ই বা না জানে, ধর্মযোদ্ধারা এমনই হন--- স্বাভিমানী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, নির্ভীক এবং আত্মবিশ্বাসী। তাঁর জন্য কাটআউটের প্রয়োজন হয় না। 'সততার প্রতিমূর্তি' স্টিকারের প্রয়োজন হয় না। অনুপ্রেরণার হোর্ডিং লাগে না। মানুষ সঙ্গে থাকে। শিরদাঁড়াওয়ালা মানুষ। সেটাই যথেষ্ট। ■

# পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসন
# সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে

**বিমল শঙ্কর নন্দ**

ব্রিটেনের মতো ভারতেও সংসদীয় বা ক্যাবিনেট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যে কোনো অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের সাংবিধানিক পদমর্যাদা সম্পর্কে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯৫৫ সালে রাম জাওয়াইয়া কাপুর বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেন, ‘‘ইংল্যান্ডের মতো আমাদের দেশেও একই ধরনের পার্লামেন্টারি এগজিকিউটিভ ব্যবস্থা আছে’’। আর সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী কেন্দ্রের মতো রাজ্যেও সংসদীয় ধাঁচের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রের রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যগুলির রাজ্যপালগণ হলেন সাধারণভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক। আর প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদের উপর। মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে রাজ্যপালের নামে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে যতটুকু ক্ষমতা ভোগ করেন অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল তাঁর এলাকায় অনেক বেশি ভূমিকা পালন করতে পারেন, অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। রাজ্যপাল একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব পালন করেন : একদিকে তিনি রাজ্যপ্রশাসনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, অন্যদিকে তিনি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তথা ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক হয় যখন রাজ্যপালের এই দুই ভূমিকার মধ্যে কোথাও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক যদি দ্বান্দ্বিক হয় সমস্যা হতে পারে সেক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসন তথা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার বিরোধকে ভারতের সংবিধান এবং এই রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিচার করা যেতে পারে।

২০১৯-এর ৩০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজ্যপ্রশাসনের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত। কেউ কেউ একে নজিবিহীন সংঘাত বললেও বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যপ্রশাসনের সংঘাত এর আগেও ঘটেছে। ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত শুরু হয়েছিল। তৎকালীন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের তেমন বিরোধ না ঘটলেও ১৯৬৭-এর ১ জুন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে ধরমবীর কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকেই রাজ্যপালের সঙ্গে মন্ত্রীসভার বিরোধ চরমে ওঠে। অভ্যন্তরীণ কলহে দীপ্ত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করেন রাজ্যপাল ধরমবীর ১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর ধরমবীরের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক এমন জায়গায় পৌঁছেছিল সে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ধরমবীরকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে নেয়। রাজ্যপাল অনন্ত প্রসাদ শর্মার সঙ্গে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বিরোধও চরমে উঠেছিল যার সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করা থেকে। এছাড়াও রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান, রাজাপাল ভৈরব দত্ত পাণ্ডে, রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী এবং রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রীসভার বিরোধ ঘটেছে। কিন্তু বর্তমান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভার বিরোধ সম্ভবত আগের বিরোধগুলিকে ছাপিয়ে যেতে চলেছে। এতদিন দল হিসেবে সিপিআই (এম) রাজ্যপাল পদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতো। এবার তৃণমূলও সেই প্রশ্ন করা শুরু করেছে। গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় সংবিধান দিবসের বিশেষ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে রাজ্য মন্ত্রীসভার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী রাজ্যপাল পদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের কারোর মতে ‘রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক পদের মর্যাদা রাখতে পারছেন না। কেউ বলেছেন ‘রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন।’ কেউ আবার আর একটু অগ্রসর হয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে ‘সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্যপাল পদের অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেতেই পারে।’

ভারতের সংবিধান প্রণয়ণের প্রক্রিয়ায় রাজ্যপালের পদ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। রাজ্যপালের নিয়োগ প্রক্রিয়া, তাঁর ক্ষমতার সীমা ও ভূমিকা সবকিছু নিয়ে অনেক আলোচনা তর্কবিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজ্যপাল পদটিকে তৈরি করার ব্যাপারে একমত হন, শুধু তাই নয়, রাজ্যপালের পদটি নির্বাচিত হবে না, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন এই বিধানটিও সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতের সংবিদান রচয়িতাগণ এটা জানতেন যে ভারতকে কখনোই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদলে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ভারতের মতো একটি বিপুল বৈচিত্র্যময় দেশে কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই কাম্য। এখানে রাজ্যপাল রাজ্যের জনগণের দ্বারা নির্বচিত হলে বা রাজ্য মন্ত্রীসভা কিংবা বিধানসভার সুপারিশ অনুযায়ী নিযুক্ত হলে তাঁর প্রাথমিক আনুগত্য থাকবে রাজ্যের প্রতি। কোনো বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি রাজ্যের পক্ষ নিতে পারেন। ফলে আঞ্চলিক স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এ কারণেই রাজ্যপাল ভারতের রাষ্ট্রপতির তথা কেন্দ্রের প্রতিনিধি। নিজস্ব ক্ষেত্রে তিনি বহু বিষয়ে সুবিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন যা নিজের ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতিও পারেন না। ১৯৬৭ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য। কিন্তু রাজ্যপালের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির মতো পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হোন এটা সংবিধান রচয়িতা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেউই চাননি। এ কারণেই সমস্ত অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রীসভাই চান রাজ্যপালের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে যাতে রাজ্যপ্রশাসন পরিচালনা করতে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়। কারণ সংবিধানের ১৫৪ কিংবা ১৬৩ ধারায় রাজ্যপালের এমন কিছু ক্ষমত আছে যাতে অনেক সময় তিনি স্ববিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। ১৫৪ ধারা অনুযায়ী ‘‘রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমত রাজ্যপালের হতে ন্যস্ত থাকবে এবং এই ক্ষমতাগুলি তাঁর দ্বারা সরাসরি কিংবা তাঁর অধস্তন অফিসারদের দ্বারা সংবিধান অনুযায়ী প্রমুক্ত হবে।’’ সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ মনে করেন যে, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালই হলেন রাজ্যের শাসনকর্তা। প্রয়োজনবোধে তিনি রাজ্যের মন্ত্রীসভার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন, মন্ত্রীসভার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন, আবার নাও পারেন। আবার এটও সত্যি যে কেন্দ্রের মতো অপরাজ্যগুলিতে সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানে ১৬৩ ধারা, অনুযায়ী রাজ্যপালকে তাঁর কাজে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকে। সাধারণ অবস্থায় রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু সাহায্য ও পরামর্শদানের অর্থ এই নয় সে, রাজ্যপালকে মন্ত্রীদের পরমর্শ গ্রহণ করতেই হবে। বরং সংবিধানে বিপরীত কথাই বলা আছে। ১৬৩ (৩) ধারা অনুযায়ী ‘মন্ত্রীগণ রজ্যপলকে কোনো পরমর্শ দিয়েছিলেন কিনা এবং দিয়ে থকলে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলা যবে না।’ তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী নির্বাচিত মন্ত্রীসভাই দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচলনা করেন। সাধারণত ভারতের রাষ্ট্রপতির মতো অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালও তাতে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু রাজ্যপ্রশাসনেরও দায়িত্ব হলো রাজ্যপালের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা। এখানে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কোনো জায়গা নেই।

বর্তমান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদলের কর্তাব্যক্তিদের প্রধান অভিযোগ, রাজ্যপাল নাকি তাঁর ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করছেন এবং সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর চেষ্টা করছেন। রজ্যপালের জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করা নিয়ে তাদের আপত্তি আর যাদবপুরে ছাত্র (?) বিক্ষোভে আটকে পড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করতে স্বয়ং রাজ্যপালের ঘটনাস্থলে যাওয়া নিয়ে তাঁদের ক্ষোভ। আইনের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলির কোনোটির ক্ষেত্রেই রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক বা আইনগত সীমা লঙ্ঘন করেননি। সংবিধানের ১৫৪ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল নিজে কিংবা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে রাজ্যের শাসন সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। তিনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। শাসনবিভাগীয় প্রধান হিসেবে রাজ্যের কর্মচারিরা রাজ্যপালের অধীনস্ত। রাজ্যের মুখ্যসচিব বা তাঁর মাধ্যমে যে কোনো কর্মচারীকে তিনি ডাকতে পারেন। তিনি রাজ্যের যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা নেই। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উচিত রাজ্যপালের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বরং মুর্শিদাবাদের ডোমকলে একটি বেসরকারি কলেজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফেরার সময় যারা রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখিয়েছিল তারাই অন্যায় করেছিল। এতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে তাঁর দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া হয়েছে যা অত্যন্ত অন্যায় অন্যদিকে রাজনীতিকে রাস্তায় নামিয়ে আনা হলো। রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পক্ষে এটা খুব ভালো উদাহরণ নয়। রাজ্যের রাজ্যপাল আইনবলে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার তার আছে। রাজ্যপালের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও রাজ্য প্রশাসন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও হয়ে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উদ্ধার করতে নিজে চলে যান। যদি সেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কোনো বড়ো ক্ষতি হতো তাতে রাজ্যের ভাবমূর্তি আরো তলানিতে চলে যেত সন্দেহ নেই। রাজ্যপাল সেই লজ্জার হাত থেকে রাজ্যকে বাঁধিয়েছেন।

রাজ্যে যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠত নিয়ে কোনো মন্ত্রীসভা থাকে, প্রশাসন সক্রিয় ও নিরপেক্ষ থাকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে তবে রাজ্যপালের সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। এ রাজ্যে শাসকদল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু রাজ্যপ্রশাসনের সক্রিয়তা নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আছে। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সক্রিয়তাও অনুভূত হচ্ছে বার বার। কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের সরকার থাকলে পারস্পরিক সন্দেহের বাতবরণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে রাজ্য মন্ত্রীসভার সঙ্গে রাজ্যপালের ব্যবধান বেড়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে এটাই ঘটেছে। কিন্তু এই লড়াই রাজ্যের উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে দিতে পারে। অবিলম্বে রাজ্যপাল ও রাজ্য মন্ত্রীসভার মধ্যে দ্বন্দ্ব না মিটলে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে। এই পরিস্থিতি আটকতে রাজ্যকেই উদ্যোগ নিতে হবে। ■

# সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণ হলো বেআইনি দখলদারিত্ব অধিকারে পর্যবসিত হয় না

**কে. এন. মণ্ডল**

গত ৯ নভেম্বর, ২০১৯, রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্কিত মামলার ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা, যে রায়ের দিকে আপামর ভারতবাসীই নয়, তাকিয়ে ছিল সমস্ত বিশ্ব। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে বিচারপতি এস. আব্দুল নাজির-সহ ৫ সদস্যের প্রবীণ বিচারপতি সমন্বিত সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মত রায় ঘোষণা করেন। রায় পড়েন মহামান্য প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। রায়টি এক নজরে নিম্নরূপ :

(১) ২.৭৭ একর বিতর্কিত জমি পাবে 'রামলালা বিরাজমান'।

(২) ৩ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি ট্রাস্ট গঠন করবে এবং বোর্ড অব্ ট্রাস্টিজ মন্দির নির্মাণ করবে।

(৩) বাবরি মসজিদের বাইরের এবং ভিতরের জমি পাবে ট্রাস্ট।

(৪) ১৯৯৩ সালে অধিকৃত ৬৭ একর জমি কেন্দ্র চাইলে ট্রাস্টের হাতে দিতে পারে।

(৫) ভালো জায়গায় অযোধ্যা শহরে ৫ একর জমি দিতে হবে মসজিদের জন্য।

(৬) বাবরি মসজিদের ভিতরের জমি যে সবসময় মুসলমানদের দখলে ছিল, তার প্রমাণ নেই।

(৭) মন্দিরের বাইরের চত্বর পুরোপুরি হিন্দুদের দখলে ছিল, তার প্রমাণ আছে।

(৮) সেবায়ত হিসাবে নির্মোহী আখড়ার দাবি খারিজ।

(৯) রামলালা আইনসিদ্ধ ব্যক্তি— রাম জন্মভূমি নয়।

(১০) মসজিদের নীচে পুরাতত্ত্ববিদদের পাওয়া কাঠামো ইসলামি স্থাপত্যের নয়।

(১১) ইলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বিতর্কিত মসজিদের জমি ৩ ভাগ করা আইনসম্মত ছিল না।

রায়ের প্রেক্ষিত বিশ্লেষণে মুখবন্ধেই সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি বলেছেন— এই মামলাকে জমি বিবাদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আদালত বিশ্বাস বা আস্থার ভিত্তিতে জমির মালিকানা স্থির করে না। আদালতের অভিমত ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর মসজিদের অভ্যন্তরে রামলালার মূর্তি স্থাপন এবং ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর মসজিদ ভাঙা বে-আইনি কাজ ছিল। প্রসঙ্গত, হাতে ন্যস্ত হয়েছে। রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্কের সূত্র অনুসন্ধানে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে উপর্যুপরি মুসলমান আগ্রাসনে হত্যা, ধর্ষণ, মন্দির ধ্বংস এবং অপবিত্রকরণের মতো ঘটনাগুলি আবার সামনে আসে। এবং বিবিধ ঘটনার অভিঘাত রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিবাদ। ১৫২৬ সালে দিল্লি জয়ের পরে বাবরের সেনারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে রাজ্য

১৫২৬ সালে দিল্লিতে ক্ষমতা দখলের ২ বছরের মধ্যেই বাবরের বিশ্বস্ত সেনাপতি ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ তৈরি করে। মসজিদটি যে খালি জমিতে তৈরি হয়নি এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন পুরাতত্ত্ব বিভাগের পেশকৃত রিপোর্টে মসজিদের নীচে যে স্থপত্যের নিদর্শন মিলেছে তা ইসলামিক ঐতিহ্যের বা ধারার নয়, তাও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। বরং মসজিদের তলা থেকে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, তা হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে। মামলায় অংশগ্রহণকারী ৪টি পক্ষের মধ্যে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে বিকল্প জমিতে মসজিদ তৈরির জন্য ৫ একর জমি দেবে সরকার, নির্মোহী আখড়ার সেবায়ত হিসাবে জমির দাবি খারিজ, তৃতীয় পক্ষ গোপাল সিংহ বিশারদের পূজা করার দাবি আদালতের রায় স্বীকৃতি পেল, যদিও তিনি ১৯৮৬ সালে লোকান্তরিত হন। আর রামলালা বিরাজমানের দাবিকে সিলমোহর দিয়ে বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির অধিকার তাদের

বিস্তারে— 'ধর্মের নামে রাজ্য বিস্তার'। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ২০১৮ সালে অযোধ্যা শহরে মুসলমান জনসংখ্যা ৩৪৬১ জন। ১৫২৮ সালে মসজিদ নির্মাণের কালে ওই জনসংখ্যা ক'জন ছিলেন যে মির বাকি অযোধ্যায় একটি বিশাল মসজিদ তৈরি করল? হিন্দুধর্মের বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণের প্রেরণা কী শুধু কয়েকজন মুসলমান ধর্মালম্বীদের নমাজ পাঠ, না হিন্দুদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত? ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় কেতন যখন পত পত করে উড়ছে— বিদেশি আক্রমণকারী সে মামলুক, খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ, লোদি, সুলতান বা মোগল যে বংশেরই হোক না কেন, নির্বিচারে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতির পীঠস্থান, ধর্মীয় স্থানগুলি আক্রমণের নিশানা করে ভারতের ধর্ম এবং সংস্কৃতি উচ্ছেদ করে ইসলামিক তমুদ্দিন এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নেশায় মেতে ওঠে, সৃষ্টি হয় রামমন্দির-বাবরির মতো বহু বিতর্ক। রাজ্য জয়ের সঙ্গে ধর্মের পতাকা বহনকারী উজবেকিস্তান

(সমরকন্দ) থেকে আগত বাবর এবং তার বিশ্বস্ত সেনাপতি কোনো ব্যতিক্রমী চরিত্র নয়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তার 'ভল্গা থেকে গঙ্গা'য় উল্লেখ করেছেন, 'তুর্কি আক্রমণকারীরা তরবারির আঘাতে হিন্দুদের দেব-দেবীর মন্দির, বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের দেবতা মিথ্যা এবং শক্তিহীন, তাদের থেকে তুর্কিরা বেশি শক্তিধর। এমনকী ভাঙাচোরা বিগ্রহগুলিকে পা-রাখার সিঁড়ির কাজে ব্যবহার করে তাদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছে'। তৈমুরের বংশধর বাবরের (মাতৃ পরিচয়ে চেংগিস খানের বংশীয়) পূর্বপুরুষরা লক্ষ লক্ষ নর হত্যায় দায়ী, তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে কলহলিপ্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ।

প্রসঙ্গত, Redsicovery of India বইয়ের লেখক আনসার হোসেন খানের বক্তব্য স্মতর্ব্য, 'Indian Muslims must remember that their forefathers, or rather their mediavel co-religionist minority rules of India were beastly frightful to the Hindus (with exception of Akbar). No Islam sanctioned their conduct. Temples were indeed demolished/ destroyed and their stones often used to construct mosque on the very site.' (অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাদের পূর্বপুরুষরা এবং স্ব-গোত্রীয়রা হিন্দুদের প্রতি হিংস্র পশুর মতো ব্যবহার করেছে (একমাত্র আকবর ছাড়া)। যা কখনো ইসলাম সমর্থন করে না। মন্দির অবশ্যই ধ্বংস করা হয়েছে এবং তার পাথর দিয়ে ওই স্থানেই মসজিদ তৈরি হয়েছে)'। হোসেন সাহেব তাঁর বইয়ে মধ্যযুগের বর্বরতা উল্লেখ করলেও, অনুল্লেখিত রয়েছে নিকট অতীতে পাক সেনা দ্বারা নিজের দেশের প্রায় ২৫ লক্ষ হিন্দু নিধন, লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণ এবং হাজার হাজার মন্দির ধ্বংসের ঘটনা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উন্মত্ত জনতার রোষে বিতর্কিত বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাক-ভারত উপমহাদেশের কয়েক হাজার মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্মকে যাঁরা রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ফায়দা তুলছেন তাদেরও খেয়াল রাখতে হবে যাতে ধর্মীয় আবেগ সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন না করে। দীর্ঘমেয়াদি সম্প্রীতির আবহাওয়া তৈরি করতে প্রয়োজনে অতীতের ভুলভ্রান্তিগুলিও সংশোধন করতে হবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধূমায়িত ক্ষোভ কার্পেটে চাপা না দিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজে বের করতে হবে— হার/জিতের অঙ্ক না কষে। এ প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের সভাপতি ওয়াসিম রিজভির মতামত বিচার্য। তিনি মনে করেন, 'রামমন্দিরের পরে মথুরা এবং কাশীসহ একাধিক তীর্থস্থান-মন্দির হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।' রিজভি সাহেবের বক্তব্যের পিছনে ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকলে— সম্প্রীতির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে এগিয়ে আসতে হবে সমাধানে।

রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্কে আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছে আদালতের রায় কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, জমির অধিকারের প্রমাণের ভিত্তিতে। আদালত মসজিদের জন্য জমি বরাদ্দ করেছে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের কোনো প্রমাণের উপর নয়। যেহেতু কোনো আইনি সংস্থা মুসলমানদের মসজিদ থেকে উচ্ছেদ করেনি, জোর করে তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিবেচনায়। বরং আদালত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে, বিতর্কিত জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের পেশ করা প্রমাণ জোরালো। বাবরি ধাঁচার বাইরের জমি যে হিন্দুদের দখলে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু ভিতরের চত্বর যে শুধু মুসলমানদের দখলে ছিল তার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। তাই তাদের দাবি খারিজ হয়েছে— দীর্ঘদিন নমাজ পড়ায় তাদের আইনি অধিকার জন্মায় না। একইভাবে, দীর্ঘদিন সেবাইত হিসাবে কাজ করলেও নির্মোহী আখড়ার দাবিকেও নস্যাৎ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এমনকী ১৯৯২ সালে ক্ষিপ্ত হিন্দু জনতার দ্বারা বাবরি ধ্বংস বেআইনি ছিল রায়ে উল্লেখ করে বাবরি ধ্বংসের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি এনে দিলেন, যদিও আলাদাভাবে ওই মামলা চলছে। আদালতের এই রায়ে কয়েক শতাব্দী পুরাতন একটি বিবাদের মিমাংসা হলো। অথচ ভারতের মুক্ত গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম এবং তথাকথিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার কারবারিরা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের খুঁত বের করে আদালতের সমাধান ভণ্ডুল করার প্রচেষ্টায় রত। শুনা যাচ্ছে মুসলমান পার্সনাল ল' বোর্ড পুনর্বিচারের রাস্তা খুঁজছে, অযোধ্যা শহরে ভালো জায়গায় ৫ একর জমি বরাদ্দের পরেও। রায়ের পুনর্বিবেচনা চাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারের আওতায় পড়ে। তবে দেখতে হবে বাড়াবাড়িতে যাতে পুনরায় সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে আর একবার প্রমাণ হলো বেআইনি দখলদারিত্ব আইনি অধিকারে পর্যবসিত হয় না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা প্রার্থনার স্থল তা মন্দির-মসজিদ যাই হোক না কেন— তার সঙ্গে বিরাট সংখ্যক মানুষের ভাবাবেগ জড়িত। আর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত অতীতেও জাতিদাঙ্গার কারণ হয়েছে। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও, ধর্মই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি এবং প্রেরণার উৎস। এই ভাবাবেগ বিপথে চালিত হলে জাতি সমন্বিত না হয়ে বিভাজিত হয়, পাকিস্তানের জন্মই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং অতীতের সংঘাত এবং ইতিহাসকে ভবিষ্যতের কলহের হাতিয়ার না করে, অতীতের ভুলগুলি শুধরে নিয়ে সকলে মিলে শক্তিশালী ভারত গঠনে ব্রতী হলে সমৃদ্ধ হবে জাতীয় সংহতি। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে, অযোধ্যা রাম জন্মভূমি--- বাবরি মসজিদ বিতর্কিত মামলাটি অত্যন্ত জটিল এবং স্পর্শকাতর, এর রায় দানের বিষয়টি বিচারকদের কাছে জটিলতার সমস্যা ছিল। তা সত্ত্বেও বিচারকদের সর্বসম্মত রায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিচারকেরা ধৈর্য ধরে মামলাটির নানা দিক--- অভিমুখ বিচার-বিশ্লেষণ করে সমগ্র জাতির কাছে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান দিয়েছেন--- আসুন, আমরা এই সমাধানকে স্বাগত জানাই।

*(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)*

# চিঠিপত্র

## অবসরপ্রাপ্ত পেনশনহীন বর্ষীয়ান নাগরিকদের শোচনীয় অবস্থা

স্বস্তিকা (৪ নভেম্বর ২০১৯)-তে প্রকাশিত শেখর সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিবন্ধ ‘সায়ন্তন জীবন’-এ আমাদের মতো অবসরপ্রাপ্ত পেনশনহীন বয়োবৃদ্ধদের জীবনের করুণ অবস্থাই প্রতিফলিত হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যখন ক্রমাগত ঘটেই চলেছে তখন সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদদের বেতন এবং বিভিন্ন রকমের ভাতা বৃদ্ধি করলেন। যদিও বিদ্যুৎ, জল, পরিবহণ, দূরভাষ তারা বিনা ব্যয়ে অর্থাৎ সরকারি ব্যয়েই পেয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিধায়কদেরও পেনশন বৃদ্ধি করা হলো। শুধুমাত্র এই নয়, সচ্ছল পরিবারের লোকজন যাতে কম সুদে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি, বাড়ি বা অন্যান্য বিলাস সামগ্রী কিনতে পারেন বা বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন সে ব্যবস্থাও হলো। তাই এবার কোপ পড়ল ব্যাঙ্কে জমা রাখা টাকার সুদের ওপর। ক্রমাগত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা টাকার (অবসর গ্রহণকালীন প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি প্রভৃতি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ) সুদের হার কমানো হতে লাগল। এমনকী প্রবীণ নাগরিক অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন্সদেরও রেহাই দেওয়া হলো না। এসসিএসএস-এ রাখা টাকার সুদের হারও বারংবার কমানো হতে লাগল। এদিকে চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী কিছু মানুষের হাতে অধিক পরিমাণে অর্থ আসার দরুন এবং পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকল। ফলে নাভিশ্বাস উঠতে শুরু হলো আমাদের মতো বয়োবৃদ্ধদের। সরকার ৮০ বছর বয়স্কদের ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়ের পরিমাণ বছরে ৫ লক্ষ টাকা করেছে কিন্তু যাদের বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকাও নয় তাদের কাছে এটা হাস্যকর নয় কি? আজ যাদের ৮০ বছর বয়স তারা অবশ্যই ১৯৯৪ সালের আগেই অবসর নিয়েছেন। ৯ শতাংশ হারে সুদ ধরলেও ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক পেতে হলে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে। তাই যত উচ্চপদেই থাকুন না তিনি আর চুরি চামারি না করে থাকলে বা অবসরের পর নতুন করে অন্য কোথাও দীর্ঘদিন চাকরি করে না থাকলে অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার ধারে কাছেও সুদ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ৫ লক্ষ টাকা আয়করে ছাড় অবসর প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে নির্মম রসিকতা মাত্র। আমি নিজে স্টিল অথোরিটি অব ইন্ডিয়ার দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট থেকে ১৯৯৩ সালে ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর নিয়েছি। অবসর গ্রহণের সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি বাবদ পেয়েছিলাম ছয় লক্ষ টাকা। সরকারের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে টাকাটা জমা রেখে ১৪ শতাংশ হার সুদে মাথা গোঁজার ঠাঁই, মেয়ের বিয়ে প্রভৃতি সম্পন্ন করেও বাকি জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু কী কপাল! তখন আলু ছিল ২ টাকা কেজি, মাছ (বড়) ৪০-৫০ টাকা কেজি ছোটো মাছ ৩০-৩৫ টাকা কেজি চাল ১০-১২ টাকা কেজি আটা ৭-৮ টাকা কেজি রান্নার তেল ৩৫-৪০ টাকা লিটার, পেট্রল ১৪-১৫ টাকা লিটার। আর বর্তমানে? তাও বেঁচে আছি, বর্তমানে ৮৫ বছর বয়সে অসুস্থ শরীরেও। সবই কপাল!

**—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

## জমাতে ইসলামি হিন্দ প্রচারপত্র ছড়াচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে

কুখ্যাত ইসলামিক মৌলবাদী সংস্থা জামাত, ২২/১ লেনিন সরণি কলকাতাতে তাদের অফিস খুলে, রাজ্যব্যাপী মৌলবাদী প্রচার চালাচ্ছে। গত ৯ থেকে ২৪ নভেম্বর তারা বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষ্যে পক্ষ পালন শুরু করেছে। তাদের প্রচারপত্রে হজরত মহম্মদকে মানবতার মুক্তিদূত রূপে দেখানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে বিশ্বের অন্য সব পথগুলি ব্যর্থ এবং ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আমরা যেন মানব আত্মার একমাত্র মুক্তির পথ রূপে নবি হজরতের প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে মেনে নিই।

এর অনেক আগে থেকেই মুসলমানরা প্রচার করছে যে হজরতের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে চলছিল— আইহামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার দশা। তারা ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবদেবী শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সদা অন্তর্কলহে লিপ্ত থাকত। হজরত এসে সেগুলিকে নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিথ্যা তথ্যগুলি সরকারি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলিতেও ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো যে হজরতের ক্ষমতা দখলের পূর্বে ওখানকার প্রতিমা পূজা করা এতটাই সঙ্ঘবদ্ধ ও সভ্য ছিল যে তারা বাইরের কোনো দেশ আক্রমণ করত না এবং সমস্ত দেবদেবী প্রতিমাগুলিকে একই মন্দিরে রেখে দিত। ওই সময় আরবে যদি শৃঙ্খলা না থাকত— তাহলে হজরত তার স্ত্রীকে রেখে দিনের পর দিন ব্যবসার কাজে বাইরে থাকতেন কী করে?

প্রাক্ ইসলামি প্রতিমা পূজকরা শক্তিশালী ও সুসংগঠিত ছিল বলেই কাবা মন্দিরে চালানো হজরতের প্রথম আক্রমণটিতে তিনি পরাস্ত হয়ে মদিনায় পলায়ন করেন। তাছাড়াও হজরত যেভাবে সারা জীবনে ১৩টির অধিক বিয়ে করেছেন সেটা তার আসুরিক প্রবৃত্তিকেই প্রকট করে তোলে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ আজ তাই সমার্থক শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম একটি ব্যক্তি ও তার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম (?) কে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরা মানবে কেন?

**—রবীন সেনগুপ্ত,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

## কাশ্মীর শব্দের উৎপত্তি

সংস্কৃত ‘কাশ’ শব্দের অর্থ ‘উজ্জ্বল’ এবং ‘মীরঃ’ শব্দের অর্থ ‘মহাসাগর’। মিলিত অর্থ দাঁড়ায় : উজ্জ্বল মহাসাগর। প্রাচীন গ্রন্থ অনুযায়ী কাশ্মীর উপত্যকা ছিল একটি বিশাল হ্রদ জলাশয়। বর্তমান ভূবিজ্ঞানীদের মতে এর

আয়তন ৭৫০০ ছিল বর্গ কিলোমিটার যা সিকিম রাজ্য থেকেও বড়ো। পুরাণ অনুযায়ী, কশ্যপ মুনি এই হ্রদ থেকে জল বের করে মানুষের বাসযোগ্য করেন। হ্রদ সংলগ্ন পর্বত অতীতে এক সময় অত্যন্ত নীচু হয়ে যায় এবং হ্রদ থেকে জল বেরিয়ে যায়। স্মৃতিরূপে আজও রয়েছে ডাল, উলার হ্রদগুলো। কাশ্মীর উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণে রয়েছে ভেরনাগ ঝরনা। এই প্রস্রবণ বা ঝর্না থেকে নদী বিতস্তা বা ঝিলম জন্ম নিয়ে কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উপত্যকার বাহিরে চলে গেছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রাচীনকালে ঝিলম নদীর জল সৃষ্টি করেছিল এক বিশাল হ্রদ। এই বিশাল হ্রদটিকে বিশাল অর্থে মহাসাগর বলা যায়। দক্ষিণ দিনাজপুরে এক বড়ো দিঘির নাম প্রাণসাগর। দিঘি সত্ত্বেও সাগর। এই ভাবেই বিশাল হ্রদ হয়েছিল মহাসাগর। সূর্য বা চাঁদের আলো প্রতিফলনে হ্রদ অতি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। হ্রদের আয়তন ও উজ্জ্বলতাই ছিল এরূপ সৌন্দর্যের মূল কারণ। বিশালতার সঙ্গে উজ্জ্বলতা ছিল হ্রদের বৈশিষ্ট্য। এসব কারণে কাশ্‌+মীরঃ যোগ হয়ে 'কাশ্মীর' হয়ে গেছে।

**—রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

## মুসলমান শাসকরা মন্দির ধ্বংস করে তার ওপরেই মসজিদ তৈরি করেছে

বাবর অযোধ্যায় রামমন্দিরকে আংশিক ভেঙে মসজিদের রূপ দিয়েছিল আর এর নামকরণ করেছিল বাবরি মসজিদ। তখনকার দিনে মুসলমান রাজাদের উদ্দেশ্যই ছিল যে কোনোভাবে হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করা। এই বাবর প্রথম রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিল। মেদিনী রাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধের পর বাবরের দুই ছেলে একজন হুমায়ুন এবং তার ভাইয়ের সঙ্গে মেদিনী রাইয়ের দুই মেয়ের জোরপূর্বক বিবাহকার্য সম্পাদন করা হয়েছিল। পরে অবশ্য মেদিনী রাই আত্মগ্লানিতে জীবনাহুতি দেন। এই মুসলমান রাজাদের উদ্দেশ্যই ছিল মন্দির ধ্বংস করে তার ওপরেই মসজিদ তৈরি করা। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের ধ্বংস করতে বেশি ওস্তাদ ছিল। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনই ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করে ১৬৬৯ সালে আদেশ দেন হিন্দুরা নতুন করে কোনো মন্দির তৈরি করতে পারবে না। এরপরে আদেশ দেন হিন্দুরা কোনো মন্দির সংস্কারও করতে পারবে না। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দুরা এতই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব মারা যাবার পর সারা ভারতের হিন্দুরা শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি দিয়ে নিজেদেরকে কিছুটা স্বস্তির পরিচয় দিয়েছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য ছেলের মাথা কেটে ঔরঙ্গজেবের পায়ে উপহার দিয়েছিলেন। তারপর দিল্লির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

**—স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর।

## স্বামীজীকে কালিমালিপ্ত। এরা ছাত্র!

ঘড়িতে এখন ৪টে। পৃথিবী গভীর নিদ্রামগ্ন। নিদ্রা আমাদের গ্রাস করছে। ক্রমশ করাল থাবা বসাচ্ছে আমাদের মননে। জেএনইউ-তে কে বা কারা স্বামীজীকে কালিমালিপ্ত করেছে। সিসিটিভি-তে কী ধরা পড়বে জানা নেই। এরকম একটা ছবি ভাইরাল হলো। কিন্তু এরকম একটা অবক্ষয়ের মাঝে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আগামীদিনের সমাজকে গড়ে তুলবে যারা সেই ছাত্রসমাজ আজ এক অন্ধকারে নিমজ্জিত। ১৫ থেকে ২২ এই বয়সটা বড়ো সাঙ্ঘাতিক। আমরা কী দিতে পারছি না ওদের? কেন এই ছাত্রসমাজ আজ পথভ্রষ্ট? রাজনীতির কারবারিরা এদের ব্যবহার করছেন। কিন্তু কেন? আপনি হয়তো আর কিছুদিন... কিছু বছর! এদের বিপথগামিতা থেকে আটকানোর দায়িত্ব এই সমাজের নয়? আপনার নয়? আমার নয়? বাংলা ভাষা আমার কাছে 'আ-মরি' তখনই যখন তা দিয়ে আরও একবার ছাত্রসমাজকে করতে পারবো নীতিনিষ্ঠ। এত স্বার্থপরতা! সমাজব্যাপী এই স্বার্থপরতা কচি কচি মুখগুলোতে নিয়ে আসছে অকাল-বার্ধক্য। ভাববার সময় এসেছে। আমরা কি কখনো ওদের মতো করে ওদেরকে নিয়ে ভাবি? স্বামীজীর কিছু আসে যায় না জেএনইউ-তে কী হলো তা নিয়ে। কিন্তু বিদ্যাসাগর বা স্বামীজী যে শিক্ষা যুবসমাজকে দিতে চাইলেন তার সার্থকতা কোথায়? হে ভারতের মানুষ জাগ্রত হও। রুখে দাঁড়াও। প্রতিবাদে বাঙ্ময় হয়ে ওঠার সময় এসেছে। মানুষের মধ্যেকার 'দেবত্ব'কে জাগিয়ে তোল যে কথা স্বামীজী বলেছিলেন ভুলে গেলে তোমরা? এ তো দেবতা নয়। কেন আমরা ছাত্রসমাজকে বোঝাতে পারছি না এই সত্য যে আমাদের সকলের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান। আমরাই ঈশ্বর। কেন আমরা এই ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি খাদের কিনারে। এক বোতল মদের বিনিময়ে কার্যসিদ্ধির এই প্রবণতা যে এই যুব সমাজকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ভেবে দেখার সময় এসেছে। বাড়িতে আর্থিক সমস্যা, মিডিয়ার মাধ্যমে প্রলোভন, রাজনৈতিক ভাবে কোনো 'দাদা'র আশ্রয়ে থাকলে সব সমস্যার সমাধান। 'দাদা'র গোপন কোনো অন্ধকার কাজে সঙ্গী হলেই সন্ধ্যেবেলা বান্ধবীকে নিয়ে নাইট ক্লাবে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের এই সহজ রাস্তায় হেঁটে আজ জেএনইউ-র বিবেকানন্দকে কালিমালিপ্ত করা। কে ধরা পড়বে? সেও তো পয়সার বিনিময়ে বিক্রিত। যেই ধরা পড়ুক সে তো শিখণ্ডী মাত্র। এই কাজটা করার জন্য অনেক কিছু পাবে সে বা তারা...। গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে কিছুদিন জেলে থেকে শুরু হবে আসল জীবন। পুরো জীবন তো পড়েই রইলো সামনে। কিন্তু এই নীতিহীনতার দায়িত্ব কার? পরিবারের, না সমাজের? ভাবতে হবে। ভাবার সময় এসেছে। হে ভারতের ছাত্র সমাজ। তোমরা একবার শুধু জেগে ওঠ। এই ভণ্ড প্রতারক সমাজের মুখের ওপর জবাব দিতে পারো একমাত্র তোমারই। যাদবপুর থেকে জেএনইউ কেন বুঝতে পারছো না তোমরা রাজনীতির পসার হয়ে গেছো।

**—পূর্বা চৌধুরী,**
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬।

# রামমন্দির আন্দোলনে সমর্পিত মাতৃশক্তি

**সুতপা বসাক ভড়**

অযোধ্যা মামলার নিষ্পত্তি জন্য অনেক মানুষ নিজ-নিজ স্তরে প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা সাকার করার জন্য নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছেন। বর্তমানের এই আনন্দের, স্বস্তির মুহূর্তগুলোর ভিত্তিভূমি স্থাপন করেছেন কিছু বিশিষ্ট জন। এই ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করব সেই মাতৃশক্তির, যাঁরা রামমন্দির আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন প্রয়াত রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, যিনি বিজেপির রাষ্ট্রীয় কার্যপরিষদে রামমন্দিরের প্রস্তাব এনেছিলেন।

বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া

সাধ্বী ঋতম্ভরা

উমা ভারতী

স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধা সাধ্বী উমাভারতী এবং কল্যাণময়ী দিদিমা সাধ্বী ঋতম্ভরা।

রামমন্দির আন্দোলনের সূচনা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ করেছিল। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংস্থাপক সদস্যা রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া সর্বপ্রথম বিজেপির রাষ্ট্রীয় কার্যপরিষদে মন্দিরের প্রস্তাব পেশ করেন। রাজমাতার এই প্রস্তাবের ফলে কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও অপ্রত্যক্ষভাবে বিজেপি এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। ১৮৮৯ সালে লালকৃষ্ণ আদবানী যখন রথযাত্রা বের করেন, তখন তার উৎসাহদাত্রী ছিলেন রাজমাতা। এছাড়াও ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে করসেবার সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন— একজন স্থিরপ্রতিজ্ঞ নেত্রী হিসেবে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কারণে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁকেও এই সংক্রান্ত মামলার অভিযুক্ত করা হয়। রামমন্দির আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকা সাধ্বী উমাভারতীর উত্থানের নেপথ্যেও রাজমাতার অবদান ছিল।

রাজমাতার হাত ধরে সাধ্বী উমাভারতী রামমন্দির আন্দোলনে যোগ দেন এবং অতি শীঘ্রই একজন সুযোগ্যা নেত্রী হয়ে ওঠেন। রামমন্দিরের সমর্থনে সারা ভারত ভ্রমণ করে বিভিন্ন সভা ও কার্যশালাতে তিনি জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এ মুখ্য মঞ্চাসীন সাধ্বী উমাভারতী প্রধান বক্তা রূপে যে ভাষণ দেন, তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এর জন্য তাঁকে আইনি চক্রব্যূহে পড়তে হয়েছে। তদন্তের জন্য গঠিত ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সি আই ডি)-র অধিকারী গঙ্গাপ্রসাদ তিওয়ারী তাঁর রিপোর্টে জানান যে, রামকথাকুঞ্জে আয়োজিত সভামঞ্চ থেকে সাধ্বী উমা ভারতীর দেওয়া উত্তেজক ভাষণই ছিল পাঁচশো বছরের কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলার উৎস।

সাধ্বী ঋতম্ভরা, বৃন্দাবনে অনাথ শিশুদের জন্য বাৎসল্য গ্রামের মতো প্রকল্প সঞ্চালিত করার জন্য প্রসিদ্ধা। তিনি কিন্তু রামমন্দির আন্দোলনের পুরোধা নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ভাষণের অডিও ক্যাসেট ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছাবার এবং আপামর জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। লিবারহান কমিশন তাঁকে এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত সাব্যস্ত করে। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে রামকথা কুঞ্জের মঞ্চে তাঁর সঙ্গে মঞ্চাসীন ছিলেন হনুমানগড়ির মোহন্ত মনমোহন দাস। সেই বিশেষ দিনটির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে ওই আন্দোলনে সাধ্বী ঋতম্ভরার ভাষণ উপস্থিত আপামর জনসাধারণের মনে নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

এই মহীয়সী নারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁদের উদ্যোগ, আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে আজ আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষেই তাঁরা এক একজন সিংহিনী। শ্রীরামলালার প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাকে আমরা বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। ■

# হঠাৎ অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাওয়া ঠিক নয়

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ওজন কমানোর জন্য আমরা প্রায় কম-বেশি সকলেই ডায়েটিংয়ের উপর ভরসা করি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ডায়েটিংয়ের আগে যা ওজন ছিল, করার পর ওজন তো কমেনি উলটে তা বেড়ে গিয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে এই সমস্যা শুরু হয় কিছুদিন পর। দেখা গেল ডায়েটিংও করছেন, অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওজন বেড়েছে পাঁচ থেকে সাত কেজি। আসলে শুধু ডায়েটিং করলেই যে এই সমস্যা কমবে এমন নয়, আমাদের শরীরের বেশ কিছু মেটাবলিজম রয়েছে যার ফলে এই ওজন বৃদ্ধির সমস্যা দেখা যায়।

(১) **ঠিক নিয়ম মেনে ব্যায়াম না করা :** শুধু ডায়েটিং করে রোগা হওয়া যায় না। কেননা যতটা শর্করা বা আরও গুছিয়ে বললে যে পরিমাণ ক্যালোরি আপনি খাচ্ছেন সেই পরিমাণ ক্যালোরি আপনাকে বার্নও করতে হবে। তাহলেই গিয়ে ফলাফলটা পাবেন। কাজেই সেজন্য সঠিক নিয়ম মেনে দক্ষ প্রশিক্ষকের অধীনে থেকে ব্যায়াম করা আবশ্যক। প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক করে ব্যায়ামের পাশাপাশি আধঘণ্টা ব্রিস্ক ওয়াকিং কিংবা অ্যারোব্রিক্স বা সাঁতার কাটতে হবে। তবে ক্যালোরি খরচ করার পরে বিশেষত সাঁতার বা অ্যারোব্রিক্সের পরেও অনেকেরই হেলথ ড্রিংক বা স্নাক্স খাওয়ার অভ্যেস রয়েছে। আর এর ফলেই বাড়ে ওজন।

(২) **ডায়েট তালিকা হয়তো সঠিক নেই :** ডায়েটের তালিকাতে যেসব খাবারকে আপনি স্থান দিচ্ছেন, তার পুষ্টি গুণ সম্পর্কে আপনাকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। ভিটামিন, প্রোটিন, আয়রন, কার্বোহাইড্রেট এগুলো ব্যালেন্সড মাত্রায় না থাকলে বা কখনও কোনও একটার ঘাটতি হলে শরীরে ডায়েট ঠিকমতো কাজ করবে না। এর থেকে হাইপোটেশন (রক্তচাপ কমে যাওয়া), অ্যানিমিয়ার মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। শর্করা আমাদের শরীরের এনার্জির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু ডায়েটিং করার সময়ে অনেকেই এই উপাদানটি বাদ দেন সচেতনভাবে। কাজেই কয়েকদিন পরেই যখন সমস্যা হয়, তখন বেশি করে কার্বোহাইড্রেট খেয়ে আরও সমস্যায় পড়তে হয়। তাই ডায়েট চার্ট করার সময় শর্করাকে বাদ দেওয়া কখনওই ঠিক হবে না।

(৩) **অতিরিক্ত মানসিক বিষণ্ণতা :** পড়ে অবাক হচ্ছেন তো? ভাবছেন বিষণ্ণতার সঙ্গে ওজন বাড়ার বা কমার কী সম্পর্ক আছে? এক কথায় বলতে গেলে আছে। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘদিন ডায়েটিং করার পরও যখন কোনও ব্যক্তি অতিরিক্ত বিষণ্ণতায় ভোগেন, তখন তাঁর আর ডায়েটিংয়ের ইচ্ছা থাকে না। মনোবিদরা বলেন, গভীর অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় থাকার ফলে মানুষ অনেক সময় ওভার ইটিংও করে ফেলেন, যা ওজন বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত । সে হয়তো নিজেই জানে না কতটা ক্যালোরিযুক্ত খাবার সে খেয়ে ফেলেছে, কেননা সবটাই হচ্ছে অবচেতন মনে। এর জন্য যায়ী কর্টিসোল নামক একপ্রকার স্ট্রেস হরমোন। মানসিক দিক থেকে বিষণ্ণ থাকলে এই কর্টিসোল হরমোনের নিঃসরণ বাড়ে, আর সেখান থেকেই যাবতীয় ঝামেলা।

(৪) **পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া :** একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুম আবশ্যক। এই ঘুম যদি না হয়, তাহলে শারীরিক দিক থেকে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর রাতে ঘুম না হলে বার বার খাওয়ার ইচ্ছে হয়। আর তখনই টুকটাক মুখচালানোর জন্য এটা-সেটা বা স্যাকজাতীয় খাবার খেয়ে নেওয়া হয়। আর এতে যে ওজন বাড়বে তা একটা বাচ্চামাত্রেই জানে।

(৫) **ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :** বহুমূত্র রোগীর ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয়। ইনসুলিন গ্রহণ করার ফলে শরীরে সুগার বেড়ে যায়, সেখান থেকে চর্বি বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া থাইরয়েড হরমোন ঘাটতি ও মেটাবলিজমের নানা সমস্যাতেও ওজন বাড়তে পারে।

**কী করণীয় :**

প্রত্যহ নিয়ম মেনে ব্যায়াম করুন। সত্যি কথা বলতে কী এর কোনো বিকল্প হয় না। মানসিক হতাশা কাটাতে সাহায্য নিন সেলফ কাউন্সেলিংয়ের। যাঁদের সান্নিধ্য আপনার ভালো লাগে, তাঁদের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান।

হঠাৎ করে নিজের মতে কোনও জোরালো ওষুধ খেতে শুরু করবেন না, তা ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ডায়েটিংয়ের আগে অভিজ্ঞ পুষ্টিবিদের কাছ থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি জেনে নিন। প্রয়োজনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ওজন কামানো যায়। ▌

# আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

রাজ্যের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের— কালিয়াগঞ্জ, করিমপুর এবং খড়্গপুর উপনির্বাচনে বিজেপি পরাস্ত হয়েছে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। বলতেই হচ্ছে, এই পরাজয় বিজেপির কাছে শুধু অস্বস্তিদায়ক নয়, চূড়ান্ত লজ্জাকরও। অন্যদিকে, বিগত লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হওয়া তৃণমূল কংগ্রেস এই তিনটি বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের ফলে মানসিক এবং সাংগঠনিকভাবে এবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। ২০২১-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, এই উপনির্বাচনের ফলাফলই প্রমাণ করবে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পায়ের তলায় হারানো জমি তৃণমূল কংগ্রেস কতটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে, এবং বিজেপিই বা তাদের লোকসভার সাফল্য কতটা ধরে রাখতে পারল। দ্বিতীয়ত, এই উপনির্বাচনের ফল যার অনুকূলে যাবে বিধানসভার দৌড়ে আপাতত সে কিছুটা স্বস্তিদায়ক অবস্থায় থাকবে। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে অনেকটাই পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। সাধারণত, উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজনৈতিক কৌতূহলের পারদ তেমন চড়ে না। কিন্তু এবারের এই উপনির্বাচন ঘিরে এই কৌতূহল রাজ্যের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। যে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আবার খড়্গপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি সম্পর্কে সবারই কৌতূহল ছিল বেশি। তার বড়ো কারণ এই বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ছেড়ে যাওয়া আসন। অর্থাৎ, বিজেপির কাছে এই আসনটি ছিল সর্বাধিক

সম্মানের আসন। গত লোকসভা নির্বাচনে খড়্গপুর এবং কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। ফলে অনেকেই আশা করেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় অনুষ্ঠিত এই উপনির্বাচনে বিজেপি সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রাখবে। তিনটির ভিতর অন্তত দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি জয়ী হবে। দেখা গেল, লোকসভায় এই বিশাল ব্যবধানে জেতা আসন দুটিও তৃণমূলের কাছে খোয়াতে হয়েছে বিজেপিকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, লোকসভা নির্বাচনের ঈর্ষণীয় সাফল্যের পর মাত্র পাঁচ মাসের মাথাতেই বিজেপির এই বিপর্যয়ের কারণ কী? কারণ একটি নয়, একাধিক। এবং কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে এটুকু বোঝা যাবে, এই উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস হারায়নি বিজেপিকে। বিজেপিকে হারিয়েছে বিজেপিই।

প্রথমেই খড়্গপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কথা ধরা যাক। এই বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্র। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রবাদপ্রতীম কংগ্রেস বিধায়ক জ্ঞান সিংহ সোহনপালকে হারিয়ে জিতে এসে চমক সৃষ্টি করেছিলেন দিলীপবাবু। এবার লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে জিতে আসার পর এই বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়তে হয়েছে দিলীপবাবুকে। দিলীপবাবুর ছেড়ে আসা এই আসনে এবার প্রার্থী হয়েছিলেন প্রেমচন্দ ঝা। প্রেমচন্দ ঝা-র প্রার্থীপদ নিয়ে প্রথম থেকেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অসন্তোষ ছিল। সে অসন্তোষের কথা তারা জানিয়েওছিলেন রাজ্য নেতৃত্বকে। এমনকী কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষককেও তারা জানিয়েছিলেন তাদের ক্ষোভের কারণ। প্রেমচন্দ ঝাঁ-র বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল, তার ভাবমূর্তি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। স্থানীয় মানুষদের ভিতরও তার তেমন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যার ভাবমূর্তি স্বচ্ছ নয়, স্থানীয় মানুষদের ভিতর গ্রহণযোগ্যতাও কম— এমন ব্যক্তিকে প্রার্থী করে রাজ্য বিজেপি মোটেই সুবিবেচনার পরিচয় দেয়নি। এক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্বের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের। মনে রাখতে হবে, খড়্গাপুরে বিজেপির কাছে লড়াইটি ছিল সম্মানের। সেই সম্মানের লড়াইয়ে সতর্কতার সঙ্গে প্রার্থী বাছাই খুব জরুরি ছিল। তা না করে, কারো ব্যক্তিগত পছন্দের একজনকে প্রার্থী করে দেওয়া রাজনৈতিক অজ্ঞতারই পরিচয় হয়েছে। ব্যক্তির স্বার্থ যে পার্টির স্বার্থের উপরে কখনো স্থান পেতে পারে না— এই শিক্ষাটি খড়্গাপুরের ফলাফল থেকে নেওয়া উচিত বিজেপি নেতৃত্বের। খড়্গাপুরে বিজেপির পরাজয়ের মূল কারণ যদি হয় সঠিক প্রার্থী নির্বাচন না করা, তাহলে অন্য আর একটি কারণ হচ্ছে, গত তিনবছর ধরে এখানে বিজেপির বিধায়ক থাকলেও স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা পূরণে তার ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার কারণে স্বয়ং দিলীপবাবুকে এবার প্রচারে গিয়ে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। খড়্গাপুরের পরাজয় রাজ্য-রাজনীতিতে বিজেপিকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলবে এবং খড়্গাপুরের বেশ চড়া মূল্যই হয়তো বিজেপিকে ভবিষ্যতে চোকাতে হবে।

করিমপুরে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন দলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। করিমপুরে জয়প্রকাশবাবুকে প্রার্থী করা নিয়েও দলের কারো কারো দ্বিমত ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন স্থানীয় প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করা হলে লড়াইয়ে সুবিধা হতো। তবে, করিমপুরে উপনির্বাচনে বিজেপির জেতার কোনো সম্ভাবনা ছিল বললে ভুল বলা হবে। করিমপুরে এতদ্‌সত্ত্বেও এই উপনির্বাচনে বিজেপির ভোট বেড়েছে। এটা ভালো লক্ষণ। তবে যে প্রচার কৌশল নেওয়া দরকার ছিল, তা যে বিজেপি নিতে পারেনি সে ভোটের ফলাফলেই প্রমাণ। উপরন্তু, নির্বাচনের দিন করিমপুরে বেশ কিছু বুথে শাসক দলের বেপরোয়া ছাপ্পা ভোটেরও প্রভাব পড়েছে ফলাফলে। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি অনায়াসেই জিতবে এমন আশা প্রায় সকলেরই ছিল। তার কারণ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল মার্জিনে কালিয়াগঞ্জে বিজেপির এগিয়ে থাকা এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্য। দেখা গেল, বিধানসভা উপনির্বাচনে এই বিশাল মার্জিন টপকে গিয়ে ভালো ব্যবধানে বিজেপিকে পরাস্ত করেছে তৃণমূল। করিমপুর এবং কালিয়াগঞ্জ এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপির বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মিথ্যা এবং বিভ্রান্তি রটনাকারী প্রচার। মানতেই হবে, তৃণমূলের এই মিথ্যা প্রচার মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে, মানুষ আতঙ্কিত হয়েছে এবং বিজেপির প্রতি বিমুখ হয়েছে। বিজেপির ব্যর্থতা এখানেই যে, তৃণমূলের এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে বিজেপি পাল্টা প্রচারটাই করতে পারেনি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বকে বারবার নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে জোরদার প্রচার অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়ার পরও রাজ্য বিজেপির তরফে এই প্রচারে তেমন মনোনিবেশ করতে দেখা যায়নি। বরং, রাজ্যের কোনো কোনো বিজেপি নেতার এ প্রসঙ্গে অবান্তর বক্তব্য আরও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। করিমপুর এবং কালিয়াগঞ্জের ফলাফল এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সঠিক প্রচার আরও জোরদারভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে বিজেপিকে। মানুষের মনের ভুল ধারণাগুলি দূর করিয়ে তাদের আবার বিজেপির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলতে হবে। এই কারণগুলি ছাড়াও, উপনির্বাচনে বিজেপির এই ব্যর্থতার পিছনে আরও দুটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে, অতিরিক্ত আত্মতুষ্টি এবং অন্যটি আত্মম্ভরিতা। গত লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়লাভের পর থেকে রাজ্য বিজেপির অনেক নেতাই অতিরিক্ত আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন। তারা ভাবতে শুরু করেছেন ২০২১-এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতটা যে পৃথক হয় তা তারা বুঝতে চাননি। তদুপরি আত্মম্ভরিতাও প্রকাশ পাচ্ছে তাদের মধ্যে। আত্মতুষ্টি এবং আত্মম্ভরিতা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জনবিচ্ছিন্ন করে তোলে। জনতার মন বুঝতে যে ব্যর্থ হয়েছেন বিজেপি নেতারা তিনটি উপনির্বাচনের ফল তার প্রমাণ। ২০২১-এ বিজেপিকে যদি সাফল্যের মুখ দেখতেই হয় তবে সর্বাগ্রে আত্মতুষ্টি এবং আত্মম্ভরিতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এখন থেকেই সংগঠনের দিকে নজর দিতে হবে বিজেপি নেতৃত্বকে। মানুষের মন বুঝতে মানুষের কাছে যেতে হবে। একটু ভাবলেই বুঝতে পারতেন বিজেপি নেতারা, লোকসভা নির্বাচনের পরপরই বিজেপি সম্পর্কে যে আগ্রহ এবং উৎসাহ জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, পাঁচমাসের মাথায় সে আগ্রহ অনেকটাই অন্তর্হিত। এটি কিন্তু যথেষ্ট অশনি সংকেত।

এই রাজ্যে এখন প্রধান দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮টি আসন পাওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরেও একটা আশঙ্কা ঘনিয়ে এসেছিল। এই উপনির্বাচনে তিনটির মধ্যে অন্তত দুটি আসনেও যদি তৃণমূল কংগ্রেস হারতো, তাহলে ২০২১-এ তার পরাজয়ের দেওয়াল লিখন এখনই পড়ে ফেলা যেত। এখন বলা যেতেই পারে, তৃণমূল অনেকটাই ঘুরে দাঁড়ালো এবং সামনে পুরসভা নির্বাচনগুলিতে তারা পূর্ণোদ্যমে লড়বে। বিজেপির সামনেও লড়াইটা আর একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। বাকি রইল বাম-কংগ্রেস জোট। তিনটি বিধানসভাতেই তারা এবারও তৃতীয় স্থানে। বলতেই হচ্ছে, মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেরার মতো জায়গায় তারা এখনো ফিরতে পারছে না।

বিজেপিকে এখন ঠিক করতে হবে তার লক্ষ্য কী? দ্বিতীয় স্থানে থাকা, না, প্রথমে উঠে আসা? প্রথমে উঠে আসতে হলে বিজেপির অবিলম্বে সংগঠন দৃঢ় করার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন। সংগঠন ব্যতীত ভোট যুদ্ধে যে জেতা যায় না— বিজেপি নেতৃত্বকে সেটা অনুধাবন করতে হবে। ■

# মহারাষ্ট্রে ভূলুণ্ঠিত ন্যায়, জয়ী রাজনীতি

**সন্দীপ চক্রবর্তী**

রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন জনকল্যাণের মাধ্যম নয়, ব্যক্তির অহংবোধ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোভনীয় স্বীকৃতি মাত্র, তখন ক্ষমতা করায়ত্ত করার যুদ্ধে অবতীর্ণ একজন যোদ্ধার যুদ্ধনীতি কেমন হতে পারে? এই প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গান্ধারীর আবেদন কবিতায় দুর্যোধন বলেছেন, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!' অর্থাৎ শত্রুকে ধ্বংস করাই রাজনীতির প্রাথমিক লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপূরণ করতে গিয়ে ন্যায়নীতি লঙ্ঘিত হলো কিনা সেটা দেখা রাজনীতির কাজ নয়। এই ভাবনারই প্রতিফলন আমরা দেখলাম মহারাষ্ট্রে।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রের মানুষের রায়ে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। তারা চেয়েছেন বিজেপি এবং শিবসেনা জোট সরকার গড়ুক। অন্য দুটি দল কংগ্রেস ও এনসিপি মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে যত সংখ্যক আসন প্রয়োজন তার ধারেকাছেও ছিল না। কিন্তু ফলপ্রকাশের পর শিবসেনা-প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বেঁকে বসলেন। তাঁর দাবি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবার কোনও একটি দলের হাতে থাকবে না। আড়াই বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবীশ আর বাকি আড়াই বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন শিবসেনার আদিত্য ঠাকরে।

বলা বাহুল্য, দাবিটি একই সঙ্গে অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত। কারণ ১৯৮৯ সাল থেকে বিজেপি শিবসেনার জোট মহারাষ্ট্রে এবং জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়। শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরে তখন জীবিত। একথা অনস্বীকার্য, বালাসাহেবের জীবদ্দশায় মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ছিল বড়ো দল। আর বিজেপি ছোটো দল। সহযোগী জোটসঙ্গী মাত্র। তখন থেকেই মহারাষ্ট্রে একটি রীতি বর্তমান। বিজেপি-শিবসেনা জোটের মধ্যে যে দল সর্বাধিক আসনে জয়ী হয় মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন সেই দলেরই কেউ। ১৯৯৫ সালের মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে শিবসেনা পেয়েছিল ৭৩টি আসন আর বিজেপি ৬৫টি। স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন শিবসেনার মনোহর যোশী। আবার চার বছর পর মনোহর যোশীর বিরুদ্ধে যখন দুর্নীতির অভিযোগ উঠল তখন তাঁকে সরিয়ে শিবসেনারই নারায়ণ রানেকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল। শিবসেনার থেকে মাত্র ৮টি আসন কম পাওয়া বিজেপি কিন্তু মনোহর যোশী অপসারিত হবার পর তাদের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে বলে অন্যায় গোঁ ধরেনি। কারণ সেটা করলে জোটধর্মকে অস্বীকার করা হতো।

> **শিবসেনা রাজনৈতিক স্বার্থে এনডিএ ছেড়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো ভিন্ন কোনও রাজনীতির অঙ্কে ফিরেও আসবে। কিন্তু রাজনীতিতে যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করল তার দাগ সহজে মুছবে না।**

অথচ উদ্ধব এবার অনায়াসে সেই কাজটাই করলেন। ভুলে গেলেন প্রায় চল্লিশ বছরের সম্পর্কের কথা। ভুলে গেলেন রামমন্দির আন্দোলন-সহ অসংখ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার কথা। ভুলে গেলেন বালাসাহেবের বহু চর্চিত মারাঠি অস্মিতার কথা। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে উদ্ধব সমঝোতা করলেন বিপরীতধর্মী আদর্শের সঙ্গে। এমন দুটি দলের হাত ধরলেন যারা স্পষ্টতই হিন্দুত্ববিরোধী। শুধু তাই নয়, মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে এই দুটি দল ইসলামিক মৌলবাদকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জোগাতেও পিছপা নয়। বলা চলে, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য মারাঠি অস্মিতা, হিন্দুত্ব— এমনকী জাতীয় নিরাপত্তার মতো বিষয় উপেক্ষা করেছেন উদ্ধব ঠাকরে।

প্রশ্ন হলো, কেন এমন একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলেন উদ্ধব? তাঁর দাবি, নির্বাচনের আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শিবসেনার আড়াই বছর করে মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। বিজেপি শিবসেনার এই দাবি মেনে নেওয়ার পরই আসন সমঝোতার কথাবার্তা শুরু হয়। যদিও অমিত শাহ নির্বাচনের কিছুদিন আগে শিবসেনা প্রধানের দাবি অস্বীকার করেছেন। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর শিবসেনা যখন মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিতে অনড় তখনও এক টুইট-বার্তায় জানিয়েছেন, আড়াই বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে শিবসেনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি।

বস্তুত, অমিত শাহ মিথ্যা বলছেন না। কারণ এরকম কোনও আলোচনা হলে তা গোপন থাকত না। এটা গোপন রাখার মতো বিষয় নয়। বরং মূলত মহারাষ্ট্রের দল হওয়ার সুবাদে শিবসেনা যদি আড়াই বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথাটি ঘোষণা করত তাহলে দলের কর্মীরা আরও উজ্জীবিত হতেন। মহারাষ্ট্রের যেসব জায়গায় শিবসেনা দুর্বল সেখানে দলের ফল আরও ভালো হতে পারত। কিন্তু তারা তা করলেন না। পুরো বিষয়টা গোপন রাখলেন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলো। দেখা গেল, বিজেপি পেয়েছে ১০৫টি আসন আর শিবসেনা ৫৬টি। অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে ৪৪টি আসন আর এনসিপি ৫৪টি। ফলাফলে স্পষ্ট মহারাষ্ট্রের মানুষ চেয়েছেন বিজেপি-শিবসেনা জোটেই সরকার গড়ুক। কিন্তু উদ্ধব জনতার রায়কে কার্যত নস্যাৎ করে আদিত্য ঠাকরেকে আড়াই বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে বলে বেঁকে বসলেন। বিজেপির পক্ষ থেকে বহুবার আলোচনার কথা বলা হলেও উদ্ধব তাতে কর্ণপাত করেননি। তিনি সম্ভবত ধরেই নিয়েছিলেন বিজেপি তাঁর দাবি মানবে না। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক, চল্লিশ বছরের জোটসঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত না করার পিছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? শিবসেনার আচরণে কি এটাই স্পষ্ট নয় যে তারা ফলপ্রকাশের পরেই বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিজেপি ১০৫টি আসনে জয়লাভ এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। উদ্ধব যখনই বুঝলেন বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি এবং ম্যাজিক ফিগারের থেকে ৪২টি আসন কম পাওয়ার দরুন শিবসেনার সমর্থন ব্যতিরেকে তাদের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না, তখনই তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিটি করলেন। উদ্ধব জানতেন আদর্শগত কারণেই বিজেপির পক্ষে কংগ্রেস বা এনসিপিকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। শিবসেনা ভিন্ন তাদের আর কোনও গতি নেই। সুতরাং বিজেপির ওপর চাপ সৃষ্টি করে মুখ্যমন্ত্রীর গদিটি আড়াই বছরের জন্য আদায় করে নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

আরও একটি কারণে সময়টি উপযুক্ত। যেহেতু নির্বাচনের আগে আড়াই বছরের মেয়াদি মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি, তাই শিবসেনার নির্বাচনী প্রচারেও বিষয়টি উঠে আসেনি--- সুতরাং, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার অবকাশ শিবসেনার ছিল না। ব্ল্যাকমেলিংই ছিল একমাত্র রাস্তা। জোটধর্মের দায়বদ্ধতায় এবার বিজেপি ১৬০টি (মোট আসন ২৮৮টি) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। জিতেছে ১০৫টি-তে। ম্যাজিক ফিগারের থেকে ৪২টি আসন কম পাওয়ায় বিজেপির পক্ষে নিজের জোরে সরকার গঠন করা সম্ভব ছিল না। তারই সুযোগ নিয়েছে শিবসেনা। বিজেপির ভোটে জিতে শেষে বিজেপিরই পিঠে ছুরি মেরে জোটধর্ম— এমনকী রাজধর্মকেও পদদলিত করেছে তারা।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত শিবসেনার এই আচরণে অনেকেই হতাশ। তারা নিশ্চয়ই মহারাষ্ট্রের এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করবেন। একটা প্রশ্ন অবশ্যই তাদের বিশ্লেষণে উঠে আসবে, উদ্ধব কি স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছেন? নাকি পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন অন্য কেউ? না, এখানে এনসিপি-প্রধান শরদ পাওয়ার বা কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ধর্তব্যের মধ্যেই নন। বিষয়টি পরিবারের ক্ষমতালিপ্সার সঙ্গে জড়িত। ইতিমধ্যেই যা মহারাষ্ট্রের বহু মানুষের চর্চার বিষয়।

এই চর্চার কেন্দ্রে রয়েছেন উদ্ধব ঠাকরের স্ত্রী রশ্মি ঠাকরে। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী শিবসেনার যাত্রাপথ তৈরি হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। উদ্ধব নন, তিনিই হাল ধরেছেন শিবসেনার ঝিমিয়ে পড়া নেতৃত্বের। ঝিমিয়ে পড়া কেন? কারণ শিবসেনা আর মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিজেপির ‘বড়ো ভাই’ নয়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর গৌরবময় উত্থানের পর শিবসেনা এখন নেহাতই মহারাষ্ট্রের আঞ্চলিক দল। এমন একটি আঞ্চলিক দল, মহারাষ্ট্রের সর্বত্র যার প্রভাব নেই। কোথাও কোথাও অস্তিত্বই নেই। শিবসেনার প্রভাব এখন মূলত মুম্বই এবং তার আশেপাশেই সীমাবদ্ধ।

অন্যদিকে বিজেপি মহারাষ্ট্রের প্রধান শক্তিতে পরিণত। মোদী সরকারের সুশাসন এবং নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তায় ভর করে বিজেপি যে ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রে আরও শক্তিশালী হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে উপায়? রশ্মি ঠাকরে নিদান দিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে পার্টিকে বাঁচাতে চাইলে শিবসেনাকে সরকারে তো থাকতেই হবে, মুখ্যমন্ত্রীও করতে হবে শিবসেনার আদিত্য ঠাকরেকে। নয়তো বিজেপির ক্রমশ বড়ো হতে থাকা ছায়াতে হারিয়ে যাবে শিবসেনা। এবং মুছে যাবে ঠাকরে পরিবারও। রশ্মি ঠাকরের বেশি দুশ্চিন্তা সম্ভবত পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই।

নরেন্দ্র মোদী যতই পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলুন, ভারতীয় রাজনীতি থেকে পরিবারতন্ত্রকে নির্মূল করা বোধহয় সহজ নয়। শিবসেনা রাজনৈতিক স্বার্থে এনডিএ ছেড়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো ভিন্ন কোনও রাজনীতির অঙ্কে ফিরেও আসবে। কিন্তু রাজনীতিতে যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করল তার দাগ সহজে মুছবে না। ■

# মূল্যবোধের শিক্ষাই কর্তব্যবোধের শিক্ষা দেয়

**রমেশ পোখরিয়াল**

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে আমরা আমাদের বিরাট দায়িত্বের বিষয়টিও উপলব্ধি করি। কেবল গুণগত শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা নতুন ভারতের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি। আমরা প্রায় ৩৩ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করছি। এদের সোনালি ভবিষ্যৎ তখনই তৈরি করা সম্ভব হবে যখন আমরা এদের সকলকে মানবতার স্তম্ভস্বরূপ যে চিরন্তন মূল্যবোধ তার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারব। আমি একথা বিশ্বাস করি, যদি কোনো ব্যক্তি মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে চান, তাহলে এটা তাঁর কর্তব্য যে, তাঁর কাজকর্ম যেন কোনো ভাবেই অন্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে। কেউ যদি বাকস্বাধীনতা চান, তবে তাঁকে অন্য ব্যক্তির চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতা দেখাতে হবে। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশ মৌলিক অধিকারের কথা বলে থাকে, কিন্তু মৌলিক কর্তব্যবোধগুলি সম্পর্কে তারা নীরব। আমাদের সংবিধানে কর্তব্যবোধের যে বিষয়গুলি উল্লিখিত রয়েছে সেগুলি সবই সোভিয়েত রাশিয়া থেকে নেওয়া। যেদিন আমরা আমাদের কর্তব্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তুলতে পারব সেদিন আমাদের অনেক সমস্য মিটে যাবে। যখন আমরা ভারতকেন্দ্রিক ধর্মসংস্কারমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলি তখন আমার মনে হয় আমাদের সাংবিধানিক কর্তব্যবোধগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ৩৩ বছর পর দেশে এক নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হচ্ছে। নতুন এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবনে মূল্যবোধ, ধর্মগত সংস্কারমূলক শিক্ষা ও ব্যাপক গবেষণামূলক বিষয়ের প্রসার দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা করবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো দেশকে আন্তর্জাতিক স্তরে এক মহাশক্তিধর দেশে পরিণত করা।

আজ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এটা তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, বৈচিত্র্যময় ভারত কেবল এক রাষ্ট্র নয়, সামগ্রিক ভাবে এক উপমহাদেশ যেখানে প্রতিটি কোণায় রয়েছ ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও পরম্পরা। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশ বিশ্বের অন্যত্র বিরল, ভারতীয় সংস্কৃতি সর্বদাই মানব সভ্যতার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অবদান জুগিয়েছে। এখন আমাদের প্রয়োজন, মানব সভ্যতার এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের সংরক্ষণে নিজেদের উৎসর্গ করা। আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির এই পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে সাধুসন্তরা তাঁদের গভীর বিচক্ষণতা ও উপলব্ধি দিয়ে অবদান রেখেছেন। মহান এই সাধুসন্তদের নামের মধ্য দিয়েই ভারত-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে আমরা একতার বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছি। আমাদের সংস্কৃতি 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর মন্ত্র এগিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করে, এই মন্ত্র একতা, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌভ্রাতৃত্ব, আস্থা, অহিংসা, আত্মবলিদান, নম্রতা ও সমতার মতো মূল্যবোধগুলিকে আত্মস্থ করতেও উৎসাহিত করে। আমরা একদা আমাদের চিন্তাভাবনার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের অগ্রণী

দেশের মর্যাদা পেয়েছিলাম, আমরা আজও একবার এই চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সারা বিশ্ব জয় করব। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই ডিজিটাল যুগে আমরা কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মূল্যবাধগুলির প্রসার ঘটাতে পারি তা এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা মূল্যবোধের উৎসগুলির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, ভারতের এক অনন্য জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভারত এমন এক দেশ যেখানে যুব সমাজের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার এই যুগে জনসংখ্যার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের আরও ক্ষুরধার করে তুলেছে। এখন আমাদের সামনে সবথেকে বড়া চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে যুব সমাজকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক উপায়ে উদ্বুদ্ধ করা যায়। আজ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংবিধানিক কর্তব্যবোধগুলি সম্পর্কে শুধুমাত্র সচেতন করাই নয়, সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই যাতে গুরুত্বের সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করতে পারে সেরকম এক অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন শিক্ষানীতিতে এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে যাতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্তব্যবোধ পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তোলা যায়। ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে কৌশলগত দিক থেকে ভারতের গুরুত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানবিক মুল্যবোধের প্রসার ঘটিয়ে দূর করতে পারি।

*(লেখক কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী)*

# বালাসাহেবের মৃত্যুর পর থেকে শিবসেনার অবক্ষয় শুরু

**অভিমন্যু গুহ**

মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে ফল ঘোষণার পর দু'টি কাজ আপাতত হয়েছে। প্রথমত, ইভিএমের প্রতি বিরোধীদের আস্থা ফিরে এসেছে। অন্তত বিজেপির জেতা শ'খানেক আসন বাদ দিলে বাকিগুলির ইভিএম নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় আরও একটা কাজ হয়েছে রামমন্দির রায়ের পর ভারতীয় সংবিধান, গণতন্ত্র, সর্বোপরি বিচার ব্যবস্থার প্রতি যে অনাস্থার জন্ম হয়েছিল, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বিচারের প্রতি আস্থা কিঞ্চিৎ ফিরেছে নিশ্চয়ই। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে সিপিএমের অসামান্য রাজনৈতিক সাফল্য, একটি আসনে তাদের জয়, বিজেপি বিরোধী সরকার গঠনে তার সহযোগ— এই 'ফিল গুড' ফ্যাক্টরে আশা করা যায় সুপ্রিম কোর্টে রামমন্দির রায় পাক জনগণ ও সিপিএমের মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, তার কিছুটা নিরাময় এবার হবে।

তবে কিনা এই আস্থা বিষয়টি যে কোনও মুহূর্তে বদলে যেতে পারে। নির্বাচনী ময়দানে বর্তমানে বিরোধী পক্ষকে খুব বেশি 'স্পোর্টিং স্পিরিট' নিয়ে খেলতে দেখা যায় না। বিজেপিকে ঠেকানোর মহান কর্তব্যে তাঁরা ভোটের আগে জোট বাঁধেন, হিস্সার গণ্ডগোল হলে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' লড়াই করেন, ভোটে গোহারা হলে ল্যাটা চুকে যায়, যত দোষ নন্দ ঘোষ হয়ে যায় ইভিএম-এ যদি একটু ভালো ফল হয় বিশেষত ভারতীয় গণতন্ত্রে আসন সংখ্যার সুবিধা তারা পায় অর্থাৎ বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে শুরু হয় নতুন খেলা। বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরের রাখার মহান কর্তব্যে আবার সবাই ঘোঁটে যোগ দেবেন। পারলে ভালো, না পারলে বিজেপি গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করছে গোছের বুলি তো রয়েছেই।

সারা দেশের মানুষ যে বিরোধীদের এই চালাকি ধরতে পারেননি তা নয়, এবারের লোকসভা নির্বাচনেই তার প্রমাণ হিসেবে করলে দেখা যাবে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পরবর্তী কিছু রাজ্যের নির্বাচনে ও উপনির্বাচনে সেরকম ভালো ফল হয়নি। এর একটাই কারণ বিজেপির সাংগঠনিক ত্রুটি যা বিরোধীদের সম্মিলিত অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টা ছিল মহারাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে। ত্রিশ বছর শিবসেনা বিজেপির জোটসঙ্গী। যখন বিজেপির পাশে কেউ ছিল না, আর এসএস সংশ্রবকে ভারতীয় রাজনীতিতে অচ্ছুত করে রাখার কৌশলী কংগ্রেসি-কমিউনিস্ট প্রচেষ্টা কার্যকর ছিল তখন বালা সাহেব ঠাকরে বিজেপির হাত ধরেছিলেন নিঃসংকোচে।

কারণ দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য। দেশপ্রাণ নিবেদন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মারাঠি অস্মিতা শিবসেনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলেও বিজেপির প্রভাবে তা হিন্দু-অস্মিতা তথা দেশ-অস্মিতায় পরিণতি পায়। শিবসেনার 'আমুচি মুম্বাই' স্লোগানকে প্রাদেশিকতা-দোষ মুক্ত করে তাকে জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত

করতেও বিজেপির সদর্থক ভূমিকা ছিল। শিবসেনার ‘বিহারি খেদাও’ মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারেনি বিজেপির সর্বভারতীয় ভূমিকার জন্যই। শিবসেনার প্রাণপুরুষ বালাসাহেব ঠাকরে এসব জানতেন। মারাঠিদের রাজনৈতিক, অধিকার রক্ষায় তাঁর সংগ্রাম মহারাষ্ট্রের মানুষ চিরদিন স্মরণে রাখবেন। বিজেপির সঙ্গে বালাসাহেবের চিরকাল শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল।

শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, ভারতীয় শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসাবে শিবাজী চিরদিনই শিরোধার্য। মোগলদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম, ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজীর অনবদ্য লড়াই কেবল মারাঠাদের মধ্যেই নয় সারাদেশেই হিন্দুদের মধ্যে শিবাজীকে বীররসের পূজারি করে তোলে। বাম-কংগ্রেসের চক্ষুশূল শিবাজী সবসময়ই, কারণ হিন্দু অস্মিতার এই প্রতীক একইসঙ্গে ভারতে বহিরাগত শাসকের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ বটে। আর্য অনার্য তত্ত্বের আবিষ্কারক বামেরা কখনই যা মানতে পারে না। অর্থাৎ বিজেপি-শিবসেনা জোট ভারতের রাজনৈতিক মঙ্গলের নিমিত্ত তৈরি এবং এই আদর্শগত মেলবন্ধন রামমন্দির ইস্যুতে মহারাষ্ট্র ও দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। নেহরুবাদী কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা তাদের পাকি-বন্ধুদের কথা ভেবে এই জোটের কট্টর বিরোধী চিরকাল।

(ফাইলচিত্র)

এই ঐতিহাসিক কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষ বালাসাহেব ঠাকরে কোনওদিন মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না। ভারতবর্ষের মানুষ, হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা তাঁর একমাত্র কর্তব্য ছিল। ২০১৯-এ মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি- শিবসেনা বনাম কংগ্রেসের আর তার সঙ্গী প্রধানমন্ত্রী পদে লালায়িত শরদ পাওয়ার, যিনি সোনিয়া গান্ধীকে বিদেশিনী আখ্যা দিয়ে যে দল তৈরি করেছিলেন সেই ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) মধ্যে লড়াই ছিল। যেখানে বিজেপি-শিবসেনা জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। যিনি গতবারও বিজেপির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেবার অর্থাৎ ২০১৪ সালে মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আচমকাই বিজেপির হাত ছেড়ে দিয়েছিল শিবসেনা। তাতে বিজেপির তো বটেই, শিবসেনারও কোনও ক্ষতি হয়নি। আলাদা লড়েও বিজেপি ১২২টি, শিবসেনা ৬৩টি আসন পায়। বিজেপির আসন সংখ্যা বেড়েছিল ৭৬টি, শিবসেনার ১৮টি। জনমতের এই রায় যে তাদের হিন্দুত্ববাদী আদর্শের পক্ষে, নবগঠিত মোদী-মন্ত্রিসভার হাত শক্ত করার পক্ষে তা বুঝে আবার দু’দলের দেশপ্রেমী সরকার হয়।

আসলে ২০১২ সালে বালাসাহেবের মৃত্যুর পর শিবসেনার অবক্ষয় শুরু। তার আগেই অবশ্য পারিবারিক ভাঙন ধরেছিল। পুত্রস্নেহে অন্ধ ছিলেন এই পূজনীয় দেশনেতা। ভাইপো রাজ ঠাকরে পুত্র উদ্ধবের সঙ্গে বিবাদে দল ছেড়ে নতুন দল গড়েছিলেন ‘নব নির্মাণ সেনা’। শিবসেনা আর নবনির্মাণ সেনা দুই দলই তাদের আদর্শ করেছে বালাসাহেবকেই। তবুও মহারাষ্ট্রের মানুষ বালাসাহেবের শিবসেনাকেই বেছে নিয়েছে এতদিন, শুধুমাত্র বালাসাহেবের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধায়। কিন্তু উদ্ধব প্রমাণ করে দিলেন বালাসাহেবের উত্তরসূরি হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই। জীবনে কোনওদিন ভোটে না দাঁড়িয়েও তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদের লোভে লালায়িত। এবং তা দখল করতে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের মতো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কট্টরবিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তার দ্বিধা নেই।

একটা কথা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। শিবসেনা যে কারণে বিজেপির সঙ্গে জোট ভাঙল, তার প্রধান কারণ আড়াই বছর তাদের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি। প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার অর্ধেক অংশ করে ভাগাভাগি যে সরকারি স্থায়িত্বের পক্ষে অন্তরায় তা বুঝতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। বিজেপির মহারাষ্ট্র বিধানসভায় আসন সংখ্যা শিবসেনার প্রায় দ্বিগুণ। কেবলমাত্র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির নেই বলে শিবসেনা তার সুযোগ নেবে, এটা বিজেপি মানবে কেন? শিবসেনা উদ্ধবের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার যোগ্য জবাব মহারাষ্ট্রের মানুষই দেবেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন রাজ্যের উত্থান এখন সময়ের অপেক্ষা।

তবে ভারতীয় রাজনীতির এই পট পরিবর্তনে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় ছাগলের তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তান কমিউনিস্ট ও তৃণমূলিদের আচার-আচরণ ভারী চমকপ্রদ। বর্তমানে সুযোগ বুঝে তৃণমূলে আশ্রিত চরম কমিউনিস্ট (মাওবাদী বা নকশাল) দ্বারা পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের ‘সর্বাধিক বিকৃত’ সংবাদমাধ্যমের নিধিরাম সর্দার মার্কা সম্পাদক বিধানসভা ভোটের নিরিখে সারা ভারতে বিজেপির ক্ষমতায় থাকা ৭০ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশ নেমে এসেছে বলে উল্লাস প্রকাশ করেছে, মহারাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে। মূর্খেরা এটা ভুলে যাচ্ছে মোদী-শাহকে রুখতে এহেন অনৈতিক জোট-ঘোঁট বিস্তর হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে। যারা নৈতিকতার বুলি আওড়ে দেশের মানুষকে ষাট-সত্তর বছর ধরে টুপি পরিয়েছেন, আজ তাদের মুখোশটা খুলে গেছে। ২০১৯-এ লোকসভার নির্বাচন দেখেও এদের শিক্ষা হয়নি, মানুষের ওপর আস্থা না থাকলে সম্পাদকমশাই দেখতে পাবেন সারা ভারতেই কেমন যেন গেরুয়া গেরুয়া দেখতে লাগছে। বিস্তর লাল ঝড় উঠবে, কৃষকের ফাটা পা ফেসবুক জুড়ে ছড়াবে। মেকি দরদের রাজনীতি হবে, তারপরও দেশটা হিন্দু সনাতন ভারতবর্ষই থাকবে, চীনের চেয়ারম্যানের আর এদেশের চেয়ারম্যান হওয়া হবে না। ■

# শ্রী ডীডওয়ানা নাগরিক সভার দীপাবলী প্রীতি সম্মেলন

শ্রী ডীডওয়ানা নাগরিক সভা, কলকাতার উদ্যোগে সম্প্রতি হিন্দুস্থান ক্লাবে দীপাবলী প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে রাজস্থানের ডীডওয়ানা অধুনা কলকাতার বাসিন্দা বহু নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে যুবক-যুবতী, মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। প্রদীপ প্রজ্বলন ও বিঘ্নবিনাশক সিদ্ধিদাতা গণেশের অর্চনা করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীমতী পুষ্পা বাঙ্গড় এবং বিনোদ ঘোড়াওয়ত। প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। উদীয়মান গায়ক নবীন ব্যাস গণেশ বন্দনা করেন। অনুষ্ঠানে মেজর শ্রীমতী দীপিকা রাঠৌরকে 'ডীডওয়ানা গৌরব সম্মান' প্রদান করা হয়। শ্রীমতী রাঠৌরকে তিলকার্চন করেন সুমন তিয়াড়ী, শাল পরিয়ে সম্মানিত করেন শ্রীমতী সুদেশ ধনকর, মাল্যার্পণ করেন শ্রীমতী পুষ্পা বাঙ্গড় এবং শ্রীফল প্রদান করেন বিনোদ ঘোড়াওয়ত। এই সংবর্ধনার সময় সভাগৃহ করতালিতে মুখরিত হয়। মহামহিম রাজ্যপালকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান ঈশ্বর ধ্যাওয়ালা, শাল পরিয়ে দেন দিনেশ ভারুকা এবং স্মারক ও অভিনন্দনপত্র তুলে দেন সভার পদাধিকারীগণ। রাজ্যপালের সহধর্মিণী শ্রীমতী ধনকরকে অভিনন্দন জানান শ্রীমতী শকুন্তলা মল্লাবত, অলকা কাকড়া, উর্মিলা ধ্যাওয়ালা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য সংস্থার অধ্যক্ষ অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, উপাধ্যক্ষ ওমপ্রকাশ বাঙ্গড় এবং রাজগোপাল পসারী 'মগনীরাম পসারী স্মৃতি শিক্ষা প্রতিভা সম্মান' প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার সচিব হরিশ তিয়াড়ী। ধন্যবাদ জানান অরুণপ্রকাশ মল্লাবত।

## নকশালবাড়িতে সুসংহত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি

গুরু নানকদেবের ৫৫০ তম প্রকাশ পর্ব উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের শিলিগুড়ির রিজিওনাল আউটরিচ ব্যুরোর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে গত ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর 'স্বচ্ছ ভারত, প্লাস্টিক মুক্ত দেশ' শীর্ষক একটি সুসংহত জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রাজ্যের সুসংহত শিশু বিকাশ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলি, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। স্থানীয় স্কুলগুলিও অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সংযোগমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি 'স্বচ্ছ ভারত, প্লাস্টিক মুক্ত ভারত' শীর্ষক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে গুরু নানকদেবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন বিষয়ক কাটআউট এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনে গান্ধীজীর অবদান নিয়েও বিভিন্ন কাটআউট প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক সুনীল তীর্কে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সচিব দলবিন্দর সিংহ ভাষণ দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সং ও ড্রামা ডিভিশন দপ্তরের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

## শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন

বীরভূম জেলার স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ১৭ নভেম্বর হাটজনবাজারের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রামরঞ্জন সিংহকে ১২০ তম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সিউড়ির স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। মাল্যদান করেন শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীসিংহকে পূজা করেন তাঁর বড়ো বউমা দরোতি সিংহ। আরতি করেন তুলসী চক্রবর্তী। উত্তরীয়, বস্ত্র, ফল, গীতা, মিষ্টি ও মানপত্র দেন জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, মিলন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার ঘোষ। বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন অলোকা গাঙ্গুলি, কাকলি দাস, সুনিশ্চিতা ও আবৃতা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেনসাংবাদিক তথা শিক্ষক পতিত পাবন বৈরাগ্য। কৃতজ্ঞতা জানান উজ্জ্বল পাল।

## শোক সংবাদ

নদীয় জেলার পলাশী শাখার স্বয়ংসেবক ভোলানাথ দাস গত ৩ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি ১ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

নদীয়া জেলার দেবগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক তথা পূবর্তন খণ্ডকার্যবাহ অলোক প্রামাণিকের পিতৃদেব নিমাই চন্দ্র প্রামাণিক গত ২৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র রেখে গেছেন।

কুমারী সর্বত্র বিরাজ করছে। কাজেই অবিদ্যাসম্পন্না কন্যা যেমন সহজেই দেখা যায় তেমনই দেবীভাবের কন্যাও প্রচুর দেখা যায়। এইসব শুভ লক্ষণযুক্ত দেবীভাবের কন্যাদের শাস্ত্রবিধি সম্পন্ন পূজা করলে, তাঁদের সম্মুখে আরতি করলে, মন্ত্র উচ্চারণ করলে, ধূপ-ধুনা দিলে তাঁদের অন্তঃকরণের শুভসংস্কারটা প্রসারিত হয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং সেই কুমারী তখন শুদ্ধ মাতৃস্বরূপিনী হয়ে মায়ের সঙ্গে একাত্মা লাভ করে থাকে। বলতে কী এমন উচ্চ সংস্কারসম্পন্ন শুদ্ধ কুমারীকেই পূজা করা হয়ে থাকে।

এই কুমারী কন্যা হবে প্রকৃত অর্থে সুন্দরী এবং দেহের 'ঋতু' ভাব বর্জিত। নারীধর্ম শুরু হওয়ার পূর্বেই তাকে আরাধনা করা উচিত। মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক-একটি রূপ। তবে শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশি প্রকাশ।' শুদ্ধাত্মা ভাবটা মেয়েদের ক্ষেত্রে দুই থেকে দশ বছরের মধ্যে প্রকটভাবে থাকে। তাই এমন বয়সের মধ্যেই কুমারীদের পূজা করতে হয়। তবে কি যৌবন শুরু হওয়ার পর থেকে বয়স্কা মেয়েরা শুদ্ধাত্মা আর থাকে না? থাকে সর্বদাই। কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে, শুদ্ধজ্ঞান ঢাকা থাকে মনের কলুষতার আবরণে।

এ কারণেই তন্ত্রশাস্ত্রে বলে, ঋতুবতী হওয়ার পূর্বে শুদ্ধ স্বভাবের কন্যাদের মধ্যে প্রবল দৈবীশক্তি জাগ্রত থাকে। কুমারী পূজার মাধ্যমে কন্যাহৃদয়ের এই সুপ্ত দৈবীশক্তিকে জাগিয়ে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করার ভাবনা থেকেই কুমারী পূজার উৎপত্তি

# কুমারী পূজা জীবন্ত শক্তির উপাসনা

**স্বামী বেদানন্দ**

আমাদের শারদীয়া দুর্গাপূজায় কুমারী পূজা হলো এক অপরিহার্য অঙ্গ। আর এই পূজার মূলে রয়েছে মহাশক্তিরই সাত্ত্বিক ভাবের আরাধনা। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যে, মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিরূপে থাকলেও নারীমূর্তির মধ্যেই তার সমধিক প্রকাশ দেখা যায়। নারী মাত্রই দেবীর অংশে জন্ম। তবে অবিবাহিতা শুদ্ধ নারীর মধ্যেই মাতৃত্বের শুদ্ধচেতনা ও অনন্ত প্রেম বেশি লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে কুমারী পূজা করা হয়। কুমারীমাতার শুদ্ধ অন্তঃকরণে অনন্ত প্রেম, পবিত্রতা ও করুণাশক্তি বিরাজ করে। তবে সব কুমারীতে নয়। যেসব কুমারীরা শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধা এবং উচ্চসংস্কার সম্পন্ন তাদের অন্তরেই মাতৃচেতনার প্রকাশ বেশি। মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক কুমারীর অন্তরে (সংস্কার অংশে) বিদ্যা সংস্কার ও অবিদ্যা সংস্কার বিরাজ করছে। বিদ্যা সংস্কার বেশি হলে সেই কুমারীকে দেখতে হয় দেবীর মতো— অত্যন্ত পবিত্রতায় ভরা মুখমণ্ডল, প্রেম ও করুণাশক্তিসম্পন্ন চক্ষুদ্বয়, দেহের গঠন অত্যন্ত সুলক্ষণা, গৌরবর্ণা, অতুল কেশরাশি— ঠিক যেন মা লক্ষ্মী। আবার অবিদ্যা অংশ বেশি থাকলে কুমারীর চোখ-মুখ হবে সংকীর্ণ, চোখের মধ্যে ভালোবাসার দীপ্ত ভাব ফুটে উঠবে না। স্বভাবে হবে একগুঁয়ে, রাগী এবং শৃঙ্খলাবিহীন। কথাবার্তা ও আচরণ তার লক্ষ্মীর মতো শ্রী ও সুন্দর হবে না। প্রকৃতিতে এই বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তিসম্পন্ন হয়েছে। সে কারণে কুমারী নির্ধারণের সময়ে সযত্নে যার পূজা হবে সেই কন্যার লক্ষণসমূহ ভালো করে দেখতে হয়। তার যেন কুরূপ না হয় কিংবা সে যেন জন্মান্ধ, খুব রোগা, চক্ষু কোটরাগত, দেহে লোম পরিপূর্ণ, অঙ্গে ব্রণ ভর্তি, দেহে দুর্গন্ধ, ঋতুমতী কিংবা হাতে বা পায়ে এক আঙুল কম সম্পন্না এবং চোখের দৃষ্টি অপরাধপ্রবণ না হয়— এসব লক্ষণ ভালো করে দেখে নিতে হয়। কারণ কুমারী পূজার উদ্দেশ্য হলো নারীদেহে দৈবীশক্তির সাক্ষাৎ জাগরণ এবং তার আরাধিতা পাদপদ্মের মধ্য দিয়ে দুঃখী-তাপিত-সহ সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তা।

প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি কেবল ব্রাহ্মণ বংশের কন্যাই পূজার জন্য কাম্য হতে পারে? তা নয়। ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা, বৈশ্য কন্যা এবং শূদ্র কন্যাও সুলক্ষণাযুক্ত হলে অবশ্যই পূজা করা যায়। দেবী পুরাণকার মতে, ব্রাহ্মণ কন্যা মঙ্গল কর্মে, ক্ষত্রিয় কন্যা সর্ব বিষয়ে জয়লাভ করতে, বৈশ্য কন্যা বিষয় লাভ করতে এবং শূদ্রা কন্যা সর্ব কর্মে শুভবোধ জাগাতে পূজিতা হতে পারে। ব্রাহ্মণ কন্যা উচ্চ বংশজাত ও শুভ সংস্কারসম্পন্ন হলে স্বভাবতই অনেকে কুমারী হিসাবে নিয়োগ করেন সত্য, তবে অন্যান্য জাতির শুভ লক্ষণযুক্ত কন্যার মধ্যেও যে অত্যন্ত দেবীশক্তি বর্তমান তা যেন

কোনওভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করা না হয়। এক্ষেত্রে আমরা বেলুড় মধ্যে কুমারী পূজার প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভাবতে পারি। তিনি বোধহয় জীবনে যে কন্যাটিকে কুমারী রূপে প্রথম পূজা করেছিলেন সে ছিল একজন মুসলমান। তখন ১৮৯৮ সাল। স্বামীজী কাশ্মীরে ভ্রমণ করছেন। সঙ্গে নিবেদিতা, ওলি বুল প্রমুখ। হঠাৎ তিনি এক মুসলমান মাঝির চার বছরের কন্যার মধ্যে প্রবল দৈবীভাব উপলব্ধি করলেন এবং তারপর সেখানেই তাঁকে কুমারী রূপে পূজা করলেন। অতঃপর ১৮৯৯ সালে তিনি কন্যাকুমারী ভ্রমণকালের শহরের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী মন্মথ ভট্টাচার্যের কন্যাকে কুমারী রূপে পূজা করেছিলেন। সর্বোপরি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার সূচনা করে অষ্টমীর দিন জ্বর গায়েও তিনি নয় জন কুমারীকে অত্যন্ত ভক্তিভরে পূজা করেছিলেন। সে সময় সাক্ষাৎ জগন্মাতা সারদাদেবী স্বয়ং মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন হলো, স্বামীজী কি স্বয়ং গুরুদেবের অনুপ্রেরণাতেই কুমারী পূজা করতে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন? আমাদের মনে হয়, স্বামীজী স্বয়ং তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এই শাস্ত্রে কুমারী পূজা করার কথা মহিমাব্যঞ্জক ভাবের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া ঠাকুরের আদর্শ তো আছেই। স্বামীজীর নিজস্ব উপলব্ধিও সহায়ক হয়েছিল।

এখন যেসব প্রশ্ন কুমারী পূজা করতে গেলে সকলের মনে ওঠে তাহলো— কুমারী পূজা কেন করা হয়। কুমারী পূজা কেমন ভাবে করতে হয়? এই পূজা করলে কী কী ফল লাভ হয়? সারা বছরই কি কুমারী পূজা করা যায়? কত জন কুমারীকে একসঙ্গে পূজা করা যায়? ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কুমারী পূজা কতদিন ধরে চলে আসছে? আমাদের কুমারী পূজার সময় কী করা উচিত? এইসব প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রাক্কালে যেটা বলা দরকার তাহলো যে, ভারতে কুমারী পূজার ইতিহাসটা খুবই প্রাচীন। প্রায় পৌরাণিক যুগ থেকে দেবীপূজার সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণী রূপে কুমারী পূজার প্রচলন হয়ে আসছে। তবে যেহেতু পূজা হলো তন্ত্রের দান তাই তন্ত্রশাস্ত্রে কুমারী পূজার মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য দেবীভাগবত, যামল তন্ত্র, দেবী পুরাণ, যোগিনী তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। দেবী ভাগবতে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত নয় দিন ধরে প্রত্যহ যথাবিধি অনুসারে কুমারী পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো কুমারীকে নিত্য সুন্দর বসন ও ভূষণে সাজাতে হবে। তার আগে অবশ্য কুমারীকে ভালো করে স্নান করাতে হবে। তারপর সুন্দর পরিচ্ছন্ন বা বেনারসি পরিয়ে তার কপালে সুন্দর চন্দনের ফোঁটা লাগাতে হবে, বস্ত্রে সুগন্ধি ও অগুরু দিতে হবে, গলায় থাকবে ফুলের মালা, আর থাকবে নানা ফুলের গহনা কিংবা অন্য অলংকার। এইসব বস্ত্র-ভূষণে সজ্জিত করে কুমারীকে বাদ্য, শঙ্খ, কাঁসা, উলুধ্বনি সহযোগে পূজামণ্ডপে তার জন্য নির্দিষ্ট রাখা আসনে এনে বসাতে হবে। অতঃপর তাঁকে সাক্ষাৎ মায়ের রূপ ভেবে পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, কুমকুম, চন্দন ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করতে হবে। তবে কুমারীকে এনে আসনে বসিয়েই পূজারি তার পা দু'টি ধুইয়ে আলতা পরিয়ে দেবেন, গলায় পুষ্পের মালা পরাবেন এবং কপালে তিলক দেবেন। এছাড়া কুমারীর সম্মুখে নৈবেদ্য প্রভৃতি ভোগদ্রব্যাদি স্থাপন করবেন এবং তাঁকে যথাসময়ে পূজা করে মুখে নৈবেদ্য প্রসাদ ও পানীয় জল গ্রহণ করাবেন। এভাবে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে কুমারীকে অর্চনা করতে করতে পুরোহিত গদগদ কণ্ঠে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করে বলবেন—

ওঁ কুমারীং কমলারূঢ়া ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভাং নানালঙ্কার ভূষিতাম্।।
রক্তাম্বর পরিধানাং রক্তমাল্য অনুলেপনাম্।
বামেন অভয়দাং ধ্যায়েদ্ দক্ষিণেন বরপ্রদাম্।।

—অর্থাৎ যিনি পদ্মাসীনা লক্ষ্মীস্বরূপা, ত্রিনেত্রা, যাঁরা মাথায় চন্দ্রকলা শোভা পাচ্ছে, যাঁর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনতুল্য, যিনি নানা অলংকারে ভূষিতা, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্তমাল্য পরিহিতা, যাঁর দেহ রক্ত ও চন্দনাদির দ্বারা অনুলিপ্ত, যাঁর বাম হাত অভয় মুদ্রা ও ডান হাত বর প্রদানে প্রসারিত সেই কুমারীকে আমরা ধ্যান করি।

আবার অন্য একটি 'তন্ত্রে'র ধ্যানমন্ত্রে আছে—

বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যা প্রকাশিনীম্।।
চারুহাস্যাং মহানন্দ হৃদয়ং শুভদাং শুভাম্।
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্।।

—অর্থাৎ যিনি তিন ভুবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং শোভন বর্ণধারিণী— সামনে উপস্থিত এই বালিকা মূর্তি, এঁর নানা অঙ্গে বিভিন্ন রকমের অলংকার থাকায় এঁর দেহটি ঈষৎ অবনত অবস্থায় আছে; ইনি অধিকারী বলে বিবেচিত হন। অতঃপর কুমারীকে ভক্তি ভরে প্রদক্ষিণ ও দক্ষিণা প্রদান করে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে বলতে হয়—

নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্য সন্দায়িনীং।
কুমার-রতি-চাতুরীং সকলসিদ্ধি-মানন্দিনীম্।।
প্রবাল-গুটি-কাস্রজং রজতরাগ বস্ত্রান্বিতাং।
হিরণ্যতুলা-ভূষণাং ভুবনবাক্ কুমারীং ভজে।।

—অর্থাৎ হে কুলকামিননী, অতুল সৌভাগ্যদাত্রী, কুমার কার্তিকের মনে আনন্দ সঞ্চারিণী, সকল সিদ্ধিদাত্রী ও আনন্দবিধায়িনী দেবী কুমারী তোমায় প্রণাম জানাই। তুমি প্রবালখণ্ডের মালা, রুপো ও রঞ্জিত বস্ত্র এবং স্বর্ণতুল্য ভূষণে অলংকিতা আছো, হে দেবী— তোমাকে ভজনা করি। তাছাড়া দেবীর একটি অন্য স্তব ও প্রণাম মন্ত্র আছে—

ওঁ আয়ুর্বলং যশো দেহি, ধনং দেহি কুমারীকে।
সর্বং সুখং চ মে দেহি, প্রসীদ পরমেশ্বরী।।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী রৌদ্রী রূপত্রিতয়ধারিণী।
অভয়ঞ্চ বরং দেহি, নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

—হে দেবী কুমারী, তুমি আমাদের আয়ু, বল, যশ, ধন ও সকলপ্রকার সুখ প্রদান করো। তুমি আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবী— তুমি ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও রৌদ্রারূপী ধারণ করে আমাদের অভয় ও বরদান করো। হে নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি।

এই কুমারী পূজা হলো জীবন্ত শক্তির উপাসনা। প্রত্যেক নারীই জগন্মাতার সাক্ষাৎ মূর্তি। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে আছে, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' এই জগতে সমস্ত স্ত্রীমূর্তিই দেবীর স্বরূপ। তবে শুদ্ধ কুমারীতেই এই মহাশক্তি দেবীর বেশি প্রকাশ। এ কারণে মহাতীর্থ কামাক্ষ্যা ও কন্যাকুমারীতে এবং ভারতের প্রধান প্রধান শাক্ত

পীঠগুলিতে নিত্য কুমারী পূজার প্রচলন হয়ে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই স্ত্রী-শরীরকে সাক্ষাৎ শক্তি বিগ্রহ বলে ভাবতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'মাটির প্রতিমায় দেবতার পূজা হয়, আর মানুষের হয় না।' এটা সত্য যে, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ। আবার মানুষের মধ্যে যাঁরা সৎ ও পবিত্র তাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি। অপরদিকে ছোটো শিশুদের নির্মল আধার হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতির প্রভাব বেশি থাকে। এ কারণেই পবিত্র কুমারীর পূজা করা হয়ে থাকে। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এক থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত কুমারীকে পূজা করার কথা বলা হয়েছে। তবে 'বিশ্বসার' তন্ত্রে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে— দশ বছরের বেশি কুমারীদের পূজা করা মোটেই বিধিসম্মত নয়। এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

যামলতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, কুমারী পূজার জন্য নির্বাচিত কন্যার বয়স এক বছর হলে তার নাম হয় 'সন্ধ্যা'। দুই বছর হলে 'সরস্বতী', তিন বছর হলে 'ত্রিধামূর্তি', চার বছরের হলে 'কালিকা', পাঁচ বছরের হলে 'সুভগা', ছয় বছরের হলে 'উমা', সাত বছর বয়স হলে 'কুব্জিকা', নয় বছরের কন্যা হলে নাম হয় 'কালসঙ্কটা', দশ বছর হলে 'অপরাজিতা', এগারো বছর হলে 'রুদ্রাণী', বারো বছরে 'ভৈরবী', তেরো বছরে 'মহালক্ষ্মী', চৌদ্দ বছরে 'পীঠনায়িকা', পনেরো বছরের 'ক্ষেত্রজ্ঞা' এবং ষোলো বছর হলে কন্যার নাম 'অম্বিকা'। এক থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত কন্যার পূজা করার কথা বলা হলেও মূলত ছয়, সাত ও আট বছরের কন্যারই পূজা করা বিধেয়। অর্থাৎ 'উমা', 'মালিনী' ও 'কুব্জিকা' নামধারী কন্যাদের পূজা করলে উত্তম ফল লাভ হয়। পূজার সময় এইসব বয়সের কন্যাদের প্রচলিত নামে না ডেকে তাদের 'উমা', 'মালিনী' নামে ডেকে ও ভাবনার মধ্য দিয়ে কুমারী পূজা করা বিধেয়।

তবে 'দেবী ভাগবত'-এ পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, দুই থেকে দশ বছরের কুমারীকে পূজা করা উচিত এবং এইসব কুমারীর পূজার সময় কী কী নামপ্রদান করা হয় ও সেই অনুসারে পূজা করলে কী কী ফল লাভ হয় তাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। যেমন—

কুমারিকা— দুই বছর বয়সের কন্যা। পূজা করলে মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্যনাশ ঘটে এবং ধন, আয়ু ও বল বৃদ্ধি পায়।

ত্রিমূর্তি— তিন বছরের কন্যা। পূজা করলে ধন-সম্পদ প্রাপ্তি ঘটে এবং পুত্র-পৌত্রাদির গৌরব বৃদ্ধি পায়।

কল্যাণী— চার বছরের কন্যা। পূজা করলে বিদ্যা ও সুখলাভ হয়।

রোহিণী— পাঁচ বছরের কন্যা। পূজা করলে মানুষের রোগ নাশ হয়।

কালিকা— ছয় বছরের কন্যা। পূজা করলে শত্রু বিনাশ হয়।

চণ্ডিকা— সাত বছরের কন্যা। পূজা করলে ধন ঐশ্বর্য প্রাপ্তি ঘটে।

শাকম্ভরী— আট বছরের কন্যা। পূজা করলে মোহগ্রস্ত করে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা যায়।

দুর্গা— নয় বছরের কন্যা। পূজা করলে দুঃখদারিদ্র্য নাশ ও কঠিনতম শুভ কাজে সাফল্যলাভ হয়।

সুভদ্রা— দশ বছরের কন্যার নাম। পূজা করলে বাঞ্ছিত দ্রব্য লাভ হয়।

মোট কথা, যে কোনও বয়সের কুমারী পূজা করা হোক না কেন তার ফল পাওয়া নিশ্চিত। সে কারণে 'যোগিনী তন্ত্রে' বলা হয়েছে যে, কুমারী পূজা না করলে কেবলমাত্র পূজা-হোম দ্বারা দেবীর পূজা সম্পন্ন হয় না। অপরদিকে কুমারী পূজা করলে পূজা-হোম সহ সমস্ত কিছুই পূর্ণতা লাভ করে। বলা হয়েছে যে, কুমারীকে একটি মাত্র ফুলও যদি দান করা যায় তাহলে সুমেরু পর্বতের মতো বিশাল ফুল দানের ফল পাওয়া যায়। আর কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিভুবনের সকলকেই ভোজন করানো হয়। এ কারণেই 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, 'কুমারী পূজা'র ফল শত কোটি মুখে বলেও শেষ করা যাবে না। তবে কুমারী পূজা করলে যে মেয়েদের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব জাগ্রত হয় এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাছাড়া দুর্গা পুজা করলে যে সমস্ত ফল পাওয়া যায় তা কুমারী পূজার মাধ্যমেও লাভ করা যায়। এখন প্রশ্ন হলো— একসঙ্গে কত জন কুমারীকে পূজা করা যেতে পারে?

'দেবীভাগবত' মতে, দেবীপূজার প্রথম দিনে একজন, দ্বিতীয় দিনে দু'জন এবং তৃতীয় দিনে তিন জন কুমারীর পূজা করা যেতে পারে। আবার প্রত্যেকদিন নয় জন করে কুমারীকেও পূজা করা যায়।

সাধারণত দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিনই কুমারী পূজা করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে বেলুড় মঠ ও অন্যান্য স্থানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে নবমীতেও কুমারী পূজা' বিধেয় বলে মনে করা হয়। তাছাড়া বছরের যে কোনও সময়ে, পবিত্র কোনও দিনে, জগদ্ধাত্রী পূজায়, অন্নপূর্ণা পূজায়, এমনকী জগন্মাতা কালিকা পূজাতেও মহাসমারোহে কুমারী পূজা করা যেতে পারে।

এই কুমারী পূজার মাধ্যমে নারীর অন্তর্নিহিত শুভ দেবীশক্তিটাই জাগ্রত করা হয়। এই অন্তর্নিহিত দৈবীশক্তি জাগালেই দেবীপূজা সার্থকতা লাভ করে। ব্যাপক অর্থে কুমারী পূজার মধ্য দিয়ে আমাদের ঘরের মা, ভগিনী, পত্নী, কন্যা প্রভৃতি নারীরূপিণীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয়। এই পূজা নারীর পবিত্র জীবন চেতনার পূজা, নারীর নারীত্বের পূজা, নারীর প্রতি তীব্র প্রেমভাবের পূজা। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, নারী শক্তিরূপা। সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপা। তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করলেই সংসার সুন্দর হয় এবং জীবনের সমস্ত দিক মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। আর নারীকেও তাঁদের এই দৈবী প্রকৃতির কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। সেজন্য নারীকে সর্বপ্রথম নিজেদের ভেতরে অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধকে জাগাতে হবে এবং তাঁদের অন্তরে যে মহাশক্তি বিরাজ করছে সে সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠতে হবে। তাঁদের আপনার অন্তরটি শুধু নারীচেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, অনন্ত শক্তিচেতনার সঙ্গে একাত্মা স্থাপন করতে হবে। এভাবে তাঁরা অনন্ত শক্তিময়ী হলেই সমাজের, দেশের ও দশের যথেষ্ট কল্যাণে সাধিত হবে। আর এ কারণেই কুমারী পূজার প্রচলন করা হয়েছে। পরিশেষে, নারী তাঁদের আপনার দিব্য স্বরূপের প্রতি আরও সচেতন হয়ে— শ্রদ্ধা, প্রেম, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধে আপ্লুত সুস্থ-স্বাভাবিক এবং মঙ্গলময় করে গড়ে তুলতে ব্রতী হয়ে উঠুন— এই প্রার্থনা করি।

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার**
**যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

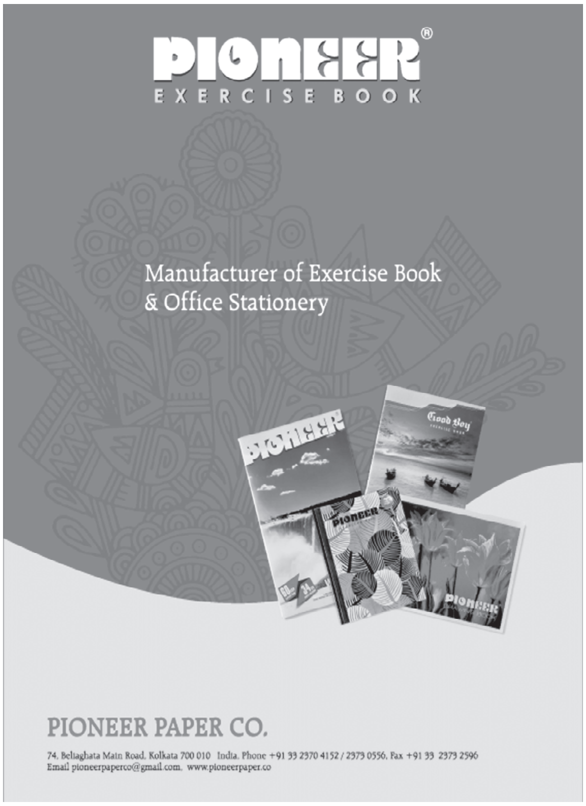


# বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

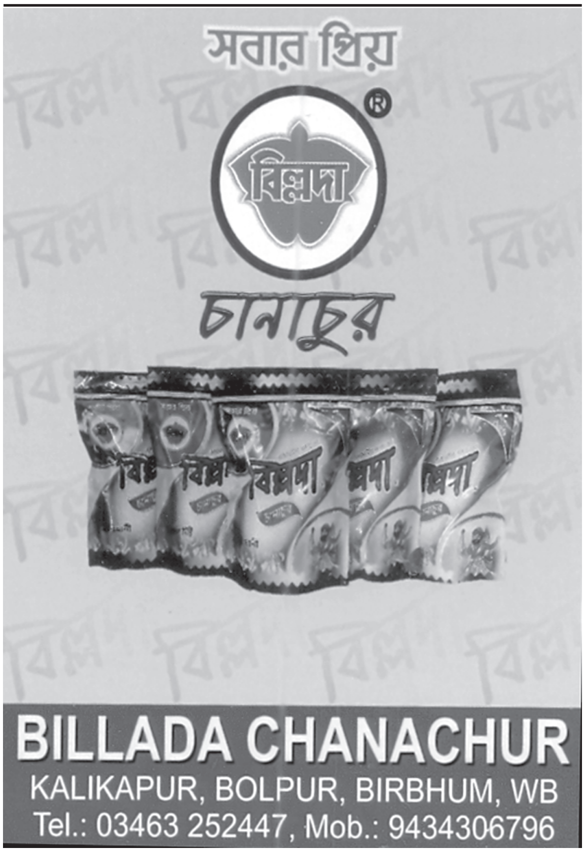

# বি প্র তী প

শেখর সেনগুপ্ত

প্রথমে জেলা আদালত, তারপর অরবিন্দ ভবন, এরপর জায়গাটা সংকীর্ণ হতে হতে চিকেন লেক, সবশেষে যেন আচমকাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই প্রকাণ্ড বাড়িটা— উচ্চতায় বিস্তারে জটিলতায় সকলকেই হার মানায়। তদুপরি, এখন মার্চ মাস, ইয়ারএন্ডিং, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠতে বাধ্য। মাস যত শেষের দিকে আসে, অস্থিরতা তত তীব্র আকার নেয়। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টাল হেডই চান, তাঁর ডিপার্টমেন্টের তাবৎ অধরা কাজগুলিকে এখনই শেষ করা হোক। হোক বললেই তো হয় না। বেশ কিছু স্টাফ ছুটি নিয়ে বসে আছে। কালচেতনা তাদের কম। অফিসারদের তাই ক্লারিক্যাল কাজও সারতে হয়। যেমন ধরুন, ওই হেডক্যাশিয়ার নন্দবাবু। অফিসার হয়েও কাউন্টারে বসে বান্ডিল বান্ডিল নোট গুনছেন কাউন্টিং মেশিনে। কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সার্ভিস পেতে উন্মুখ কাস্টমাররা। মেশিন কাজকর্মে যতই আধুনিকতা নিয়ে আসুক না কেন, ম্যানুয়াল লেবার ছাড়া কাজে যেন ঠিক প্রাণ আসে না। ঋতুচক্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন প্রকল্প আসে ব্যাঙ্কে। সড়গড় হতে গিয়ে আধিকারিকরা হিমশিম খান। ব্যাঙ্কের গার্ড তিনকড়ি রাম, চিবুকে তার হালকা দাড়ি, কোলাপসিবল গেটের তালা খুলতেই সেই যে সব স্রোতের মতো ঢুকছে, বের হচ্ছে, চলবে বিকেল চারটে অবধি।

প্রতিটি সেকশনে বা ডিপার্টমেন্টে কিংবা ডিভিশনের উৎসমূলে যতই হুল্লোড় চলুক না কেন, এই মুহূর্তে ব্যাঙ্ক-ব্রাঞ্চের এস. আই. বি. ডিভিশনটা তুলনায় অনেক শান্ত, ছিমছাম। ডিভিশনাল ম্যানেজার রত্নাকর রক্ষিত হাতের তালুর মতো জানেন, কোন লোন অ্যাকাউন্টের কী অবস্থা। তাঁর এ কাজে মস্ত সহায়ক দুই ফিল্ড অফিসার— বাসুদেব কুণ্ডু এবং কুশল সেনগুপ্ত। দু'জনই বয়সে নবীন। ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলেন সরাসরি অফিসার হয়ে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁদের আদৌ অরক্ষিত অবস্থায় নেই। বাসুদেব সামলান কল-কারখানায় ঢেলে-দেওয়া ব্যাঙ্কের দাদন। আর কুশল মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়েন ব্যাঙ্কের অনাদায়ী টাকা উদ্ধারে। নিজের সর্বস্ব উজার করে তাঁর সেই ভয়ডরহীন প্রাত্যহিক একক অভিযান। দুবার অসাধু বরোয়ারের চক্রান্তে আক্রান্তও হয়েছেন, যদিও প্রাণসংশয়ের ঘটনা আজ অবধি ঘটেনি। রত্নাকর রক্ষিত মুগ্ধ,— তাঁর ডিভিশনের এই দুই তরুণ অফিসার কালে কালে ব্যাঙ্কের মাথায় গিয়ে ঠিক বসবেন। ওদের সততাও প্রশ্নাতীত,— হাত পাতার দৃষ্টান্ত নৈব বৈ চ।

আজ প্রথম বেলাতেই কুশল সেনগুপ্ত তাঁর বস রত্নাকর রক্ষিতের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, 'স্যার, আমি আজ এ বেলাতেই বের হবো।'

'টাকা আদায়ে?'

'ইয়েস স্যার। মাত্র দুটো ইউনিট। ভেরি ব্যাড রেকর্ড।'

'কোন জায়গায়?'

'শক্তিগড়।'

'সে তো অনেকটা দূর। ব্যাঙ্কের গাড়ি কি এখন পাবেন?'

'দরকার নেই। আমি নিজের স্কুটার নিয়েই বের হবো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরেও আসবো।'

'ও কে। আই উইশ ইয়োর সাকসেস।'

রক্ষিতের একগাল হাসি।

মাত্র দুটো ইউনিট। একটা আর একটার প্রায় লাগোয়া। কিন্তু ঋণের চরিত্র ও পরিমাণ একেবারে আলাদা। একটার প্রাণশক্তি টিমটিমে। অন্যটায় যেন এলাহি ঝড়। একটা ফুটো নৌকা। অন্যটা ফ্রিগেট জাহাজ। দুটোই জলে ভাসছে। একটা ডুববেই। দ্বিতীয়টা খেপে-ওঠা সাগরকেও পরোয়া করে না। লোনের পরিমাণও তদনুযায়ী আকাশ-পাতাল। একজনকে

লোন দেওয়া হয়েছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। অন্যজনকে একুশ লক্ষ টাকা। একটি ডি. আর. আই লোন, অন্যটা এস. বি. এফ. লোন। প্রথম গ্রাহক একজন মহিলা। দ্বিতীয় জন পুরুষ। সবদিক থেকেই তাঁরা দু'জন প্রায় দুই মেরুর। মিল কেবল ব্যাঙ্কের খাতায় একটি ক্ষেত্রে— গত আড়াই মাস ধরে দু'জনেরই কোনও সাড়াশব্দ নেই। ব্যাঙ্কে আসা নেই। টাকা জমা দেওয়াও বন্ধ। নোটিশ পাঠাবার আগে কুশল নিজে একবার খুঁচিয়ে আসতে চান। বরোয়ার হলেও এঁরা আদতে অচেনা। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হুট করে কাউকে 'মহাখচ্চর' বলাটা অনুচিত।

নামমাত্র সুদে ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন শকুন্তলা মাঝি। বাঁশ-কঞ্চি দিয়ে ঝুড়ি বোনাই তাঁর কাজ। ঋণের টাকায় বাঁশ-কঞ্চি কিনবেন, প্রতি মাসে ব্যাঙ্কে গিয়ে একশো সত্তর টাকা করে জমা দিয়ে তিন বছরের মধ্যে সুদে-আসলে ঋণ পরিশোধ করবেন। অন্যদিকে একুশ লক্ষ টাকার ঋণী ক্ষমতাসীন দলের এক স্থানীয় তালেবর, প্রকাণ্ড মিষ্টির দোকান। শর্ত, বেচাকেনার টাকা নিয়মিত ভাবে জমা দিতে হবে, তুলতে হবে। তিন মাস অন্তর সুদের টাকাটা কিন্তু মেটাতে হবে। নাম তাঁর তিলক দাঁ,— এক ডাকে ওই এলাকায় সকলেই তাঁকে চেনে।

কুশলের স্কুটার ছুটছে। তাম্রাভ রোদ্দুর। পথে জনতার জটলা, হরেক যানবাহনের কাটাকুটি খেলা। ফলে সময় সময় কুশলের গাড়ি এমন গতিমন্থর যেন চাকা দুটো বালুচরে বসে যাচ্ছে। তারই মধ্যে চলছে স্থানীয় ময়দানে বইমেলার তোড়জোড়। ট্রাফিক পুলিশের তিরিক্ষে মেজাজ আর চাপা থাকে না। ঘামে ভেজা গালগলা নিয়ে কুশল পার হচ্ছেন একটার পর একটা আবর্ত। গ্যাংপুর পার করে গাড়ি  বাঁক নেয়। অবশেষে শক্তিগড়ের সবচেয়ে  উপেক্ষিত এলাকায় শকুন্তলা মাঝির টালির চালাঘরের সামনে থেমে যায় দু' চাকা।

মুখ তুলতেই নজরে এলেন শকুন্তলা মাঝি। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের বিন্যাস। সচরাচর এঁরা দ্বি-চারিণী হন না, যদিও দেহের অনেকাংশ অনাবৃত অর্থাৎ উন্মোচিত।

'স্যার, আপনি!'

—স্বরে বিস্ময়।

'তেল পুড়িয়ে আসতে বাধ্য করলেন।'

'বাবু।'

'ক' মাস ধরে টাকা জমা দিচ্ছেন না, খেয়াল আছে?'

'বাবু, পোড়া কপাল। বড়ো ছেলেটা ঝুড়ি নিয়ে মহাজনের কাছে যাচ্ছিল। টোটোর ধাক্কায় বুকের পাঁজর ভাঙল। তবুও হাসপাতাল একটা বেড দিলে না গো।...'

ঘোরতর আবেগে গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে আসে শকুন্তলার। বড়ো মর্মভেদী। কী বলবেন ব্যাঙ্কের ফিল্ড অফিসার? যেন অনির্বচনীয় লজ্জায়-গ্লানিতে বিড় বিড় করতে থাকেন, 'থাক, এখন ব্যাঙ্কে যেতে হবে না। আমিই দু'-দশ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করে দেব। ছেলে আপনার সুস্থ হয়ে উঠুক।'

নিজের স্কুটারের দিকে ফিরতে চাইলেন কুশল। কিন্তু পারলেন না। পিছন থেকে বলে ওঠেন শকুন্তলা, 'স্যার একটু দাঁড়ান। আমি অনেকটাই সামলে নিতে পেরেছি। ঝুড়িও বুনছি, আবার লোকের বাড়ি কাজও ধরেছি। কুটনো কেটে, বাসন মেজে, ঘর ঝাঁটিয়ে মাসে হাজার টাকা পাই। মরদকে আর মরে গেলেও মদ গিলতে পয়সা দেব না। আপনি এটা নিন। অত দূর থেকে এলেন। রসিদ থাকলে একটা দেবেন।'

কুশল কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যালিয়ে চেয়ে থাকেন। শকুন্তলার হাতে একশো টাকার একখানা নোট।

পরবর্তী টার্গেট বাবু তিলক দাঁ। শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচা বিক্রির দোকান তাঁর। কলকাতাতেও অনেকের বাড়িতে ল্যাংচা যায় এ দোকান থেকে। বহু নামি ফিল্মস্টার থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন দলের এক বিপুল বপুধারী নেতার সঙ্গে তোলা আছে তাঁর দন্তবিকশিত একাধিক ছবি। সেই সব ছবি বাণিজ্যের অনুষঙ্গ হয়ে ঝুলছে দোকানের দেওয়ালে।

কুশলকে দেখে দাঁ ভুরু কোঁচকান। গদিতে আসীন। দু' পাশে ও পিছনে জনা কয়েক সুদেহী। কর্মচারীরা ব্যস্ত। বড়ো বড়ো প্যাকেটে ঢুকছে রসালো ল্যাংচা। সার সার খান সাতেক গাড়িতে বসে আছেন ভি. আই. পি. খদ্দের। এ চাহিদার কোনও যতিচিহ্ন নেই।

'কী ব্যাঙ্কবাবু, হঠাৎ?'

'আপনি টাকা লেনদেন করছেন না কেন?'

'সময়ের অভাব। ওসব খুচরো কাজ রোজ করা যায় না। অনেক দিক সামলাতে হয়। যাক, এসে পড়েছেন যখন, হাজার দশেক টাকা নিয়ে যান। আর একটু মিষ্টিমুখও করুন।'

'এ রকম কিন্তু শর্ত ছিল না। ব্যাঙ্কের নিয়ম—'

'আরে থামুন তো। নিয়ম সকলের জন্য যে সমান হয় না, সেটা আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি। আপনি বরং রোজ সময় করে আমার কাছে আসুন। জমা দেবার মতো ক্যাশ থাকলে আপনার হাত দিয়েই পাঠাবো। আর যখন টাকার দরকার হবে, আপনাকেই চেক সই করে দেবো। আপনি পরদিন টাকা দিয়ে যাবেন। হে-হে-হে...'

কুশল সেনগুপ্ত তাঁর মাথায় রক্তের চোরাটান অনুভব করেন। কিছু প্রত্যুত্তর দিতে গিয়েও শব্দ খুঁজে পান না। গলা দিয়ে একটা সরু শব্দ বেরিয়ে আসে মাত্র। রাজ্যে এ রকম ইউনিটের সংখ্যা বাড়ছে। ইদানীং প্রতিটির পিছনে পলেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। আগে ও পরে আমার কী করণীয়  ভাবতে ভাবতে ব্যাঙ্কের রসিদ বইটাকেই আঁচড়াতে থাকলেন কুশল।■

বিশেষ প্রতিবেদন

# প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রাঙ্গণে

**ইন্দ্রনীল মজুমদার**

আচ্ছা, কেমন হতো যদি এমন স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া যেত যেখানে খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় প্রকৃতির মাঝে লেখাপড়া করা যেত বা কোনো বিষয়ের নীরস তাত্ত্বিক দিকটা না তুলে ধরে প্রয়োগিক দিকটাই তুলে ধরা হতো এবং শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট পাওয়ার সময় আমাদের আশীর্বাদ করে যদি বলা হতো এতদিনে যা যা শিখেছ তাই প্রয়োগ কর বা যথাযথভাবে কাজে লাগাও। তবে বিদ্যাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতাম আর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বিষয় নিয়ে পড়ে সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হতো না। আচ্ছা, যদি আমাদের শেখানো হতো একজন ডিগ্রিধারী মানুষ (পড়ুন রোবট) নয়, বরং মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার বিদ্যা তাহলে খুবই ভালো হতো তাই না? অনেকেই হয়তো ভাবছেন এই বিশ্ব চরাচরে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি সত্যিই পাওয়া যেত! সবারই জানলে অবাক হতে হবে যে প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষাধারা এমনটাই ছিল। অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি এতটাই উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। তা এবার আমরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে সেই উন্নত শিক্ষা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করব।

প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রতিটা মানুষের সমাজজীবন চারটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। যথা : (১) ব্রহ্মচর্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বাণপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। এগুলো যেন মানবজীবনের চারটি স্তরবিশেষ এবং জীবনের এই চারভাগের বিধানের দ্বারাই মানুষের জীবন পরিচালিত হতো। ছাত্রজীবনকে বলা হতো 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। আমাদের মূল আলোচনা এই আশ্রমকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ছাত্রদের গুরুগৃহে পাঠ নিতে হতো। একজন গুরুকে কেন্দ্র করে একটি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালিত হতো যাকে বলা হতো গুরুকুল। এই গুরুকুল শব্দের অর্থ হলো গুরুর গৃহ বা আশ্রম। এখানে বলা ভালো যে সব গুরুকুলই অরণ্যে অবস্থিত ছিল না বা সব গুরুই অরণ্যবাসী ছিলেন না। গুরু যাঁরা হতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বলা যায় গৃহী-শিক্ষক এবং বেশিরভাগ গুরুকুলই লোকালয়ে অবস্থিত ছিল। লোকালয়ে অনেক সময় বহু শিক্ষকের সমাগমে অনেক বড়ো বড়ো নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তখন নানা মুনি-ঋষির আশ্রমেও শিক্ষাদান হতো। আসলে, প্রাচীন যুগে 'আশ্রম' বলতে সংসারত্যাগী মানুষদের আবাসস্থল এবং সাধনা ও শাস্ত্রচর্চা করার কেন্দ্রকে বোঝাতো। এখনও তাই বোঝায়। মুনি-ঋষিরা এইসব আশ্রমে সপরিবারে বসবাস করতেন। এই মুনি-ঋষিরাই গুরুরূপে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন। প্রাচীনকালে এইসব আশ্রম বা গুরুগৃহগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই আশ্রমগুলিতে এক বা একাধিক গুরু থাকতেন যাঁরা ছাত্রদের বিজ্ঞান, গণিত রাজনীতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, শাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা

ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিতেন। তৎকালীন ভারতীয় জীবন যেমন আশ্রমভিত্তিক ঠিক তেমনি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল আশ্রম ভিত্তিক। নির্দিষ্ট একটি বয়সে পিতা-মাতা সন্তানদের লেখাপড়া শেখার জন্য আশ্রমে বা গুরুগৃহে পাঠিয়ে দিতেন। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে উপনয়নকৃত বালক সকল নিয়মনিষ্ঠা পালন করে গুরুগৃহ থেকেই বেদ, বেদাঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করত। সাধারণত বাণপ্রস্থীরা গুরুর দায়িত্ব পালন করতেন। তখনকার দিনে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক এখনকার ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক ছিল না, বরং তা ছিল অনেকটা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। গুরুর প্রতি সকল ছাত্রের শ্রদ্ধা এতটাই ছিল যে গুরুনিন্দা তো কল্পনাতীত এমনকী তা শোনাও ছিল মহাপাপ। আর গুরুর নির্দেশই যে কতখানি বেদবাক্য ছিল তা মহাভারতের আরুণির কাহিনি পড়লেই বোঝা যায়। তখনকার দিনে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে কোনো অর্থ লাগত না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষাদান করানো হতো। 'গুরুদক্ষিণা' বলতে তখন ছিল গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা। ছাত্রদের মধ্যে জাতপাত, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি প্রভেদ ছিল না। সমাজের দরিদ্রতম ছাত্রটিরও শিক্ষালাভ করার সুযোগ থাকত। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এইসব আশ্রমের সমস্ত ব্যয় বা খরচ চালানো হতো রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি থেকে। আবার কোনোও কোনোও আশ্রমে গুরুই শিষ্যদের গৃহস্থদের বাড়িতে বাড়িতে পাঠাতেন ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহের জন্য যার দ্বারা তারা তাদের অন্নের ব্যবস্থা করত।

এবার আমরা জেনে নেব প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদানের পদ্ধতি। পরিণত বয়সেই গার্হস্থ্য ব্যক্তি তাঁর বাণপ্রস্থ জীবন শুরু করতেন। অতএব তাঁর মস্তিষ্ক ভাণ্ডারে সঞ্চয় হয়ে থাকত জীবন থেকে পাওয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা। বাণপ্রস্থী গুরুরা তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ছাত্রদের সামনে জ্ঞানের আকারে তুলে ধরতেন। তাই, বলা যায়, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাধারা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছিল। আর আমরা তো জানি জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের অনেক কিছুই শেখায়, তারা প্রত্যেকেই আমাদের শিক্ষক। আর যখন শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তুলে ধরার কথা উঠছে তখন প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা মানবজীবনের ও মনের কতটা কাছে ছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয় বৈকি! আর একটা অসাধারণ ব্যাপার না বললেই নয় তা হলো প্রাচীন বৈদিক সমাজে ছাত্রদের শিক্ষাদান করা হতো মূলত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে। এই তিন পদ্ধতির সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

প্রথমে গুরু যে পাঠ দিতেন ছাত্ররা তা শুনত। এই পদ্ধতিকে বলা হতো শ্রবণ। শোনার পর ছাত্ররা সবাই মিলে তা আবৃত্তি করার চেষ্টা করত। এরপর তারা ব্যক্তিগতভাবে গভীর চিন্তার দ্বারা তা মনে রাখার চেষ্টা করত। এই গভীরভাবে চিন্তা করার পদ্ধতিকে বলা হতো মনন। তারপর, তারা একাগ্রচিত্তে ধ্যানের মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করত। এই ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করাকে বলা হতো নিদিধ্যাসন আর এই নিদিধ্যাসনের দ্বারা তারা জ্ঞানলাভ করত। আর এইরকমভাবেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে একাগ্রতা বৃদ্ধিলাভ করত। তবে, একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্যে শিক্ষার্থীরা রোজ জপ-ধ্যান (অর্থাৎ আহ্নিক)-ও করত। আজকের শিক্ষার্থীরা এ ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি কল্পনা করতে পারবে কি না সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। এই শ্রবণ ও মনন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় জেনে রাখা ভালো যে প্রাচীনকালের শিক্ষার্থীরা যে বেদ পাঠ করত তা অনেক বছর লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যদিও ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীনকালের বৈদিক যুগে মানুষ লিপির ব্যবহার জানত না, কিন্তু বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী বৈদিক যুগেও মানুষ লিপির ব্যবহার জানত। তাহলে লিপিবদ্ধ হয়নি কেন? এর উত্তরে অনেকেই বলেন যে, হয়তো শিক্ষার্থী বা শিষ্য গুরুর কাছ থেকে সরাসরি নেওয়া শিক্ষা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে ধ্বনি ও ছন্দ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে এবং শিষ্যের একাগ্রতা ও মনে রাখার ক্ষমতাও বৃদ্ধিলাভ করবে বলে লিপির ব্যবহার প্রচলন থাকলেও বেদ লিপিবদ্ধ হয়নি। এর থেকে প্রাচীন ভারতীয়দের একাগ্রতা ও স্মরণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রতিফলিত হয়।

প্রাচীন ভারতে বিদ্যা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল যথা— (১) পরা বিদ্যা ও (২) অপরা বিদ্যা। এখন বিদ্যার এই দুই বিভাগ সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিই।

(১) **পরা বিদ্যা :** সাধারণত ব্রহ্মবিদ্যাকে পরা বিদ্যা বলা হতো। এই পরা বিদ্যার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরলাভ বা নিজের প্রকৃত স্বরূপ বা 'আমি'কে উপলব্ধি করত। আর এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীরা পরম শান্তি ও অমৃতত্ব লাভ করত। এর থেকে বলতে পারি যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীরা এখনকার মতো স্ট্রেস, টেনশন বা দুশ্চিন্তা নিয়ে চলত না, বরং তারা এক পরম শান্তিতে এবং আত্মোপলব্ধি লাভের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করত। অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীরা পরাবিদ্যা লাভ করার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা শিক্ষার্থীজীবন থেকে সরাসরি সন্ন্যাসী হতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ভারতে বেশিরভাগ মানুষই গার্হস্থ্য আশ্রম শেষ হলে ঈশ্বরলাভের সাধনায় ব্রতী হতেন। আসলে প্রাচীন ভারতে মানুষের জীবনের লক্ষ্যই ছিল 'ঈশ্বরলাভ করা' আর সম্বল ছিল 'ত্যাগ'। ভোগের জীবন তারা বর্জন করে সৃষ্টিকর্তাকে জানাই যে জীবনের পরম ব্রত তা তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন।

(২) **অপর বিদ্যা :** প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে শিক্ষার্থীদের বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন এবং নানা সূত্র সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হতো। তবে বৈদিক যুগের শেষে শিক্ষার্থীদের চতুর্বেদ ছাড়াও বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নক্ষত্রবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, শিল্প, ব্রহ্মবিদ্যা, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি বিষয় পড়তে হতো। এই যে বিজ্ঞান, কলা, শিল্প প্রভৃতি ব্যবহারিক বা লৌকিক বিদ্যার অনুশীলন করাকে 'অপরা বিদ্যা' বলা হতো। এই অপরা বিদ্যা পাঠের মাধ্যমে সংসারে অর্থলাভ করার উপায় জানা যেত। অপরা বিদ্যালাভ করার পর বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য আশ্রম বা সংসারজীবনে প্রবেশ করত। প্রাচীন ভারতে প্রয়োগিক বা ব্যবহারিক বিদ্যা দান করা হতো শিক্ষার্থীকে যাতে সে তার বিদ্যাকে প্রয়োগ করে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারে। তাই সে সময় শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে সেই ভাবেই তাদের গড়ে তোলা হতো। এবার আমরা জানব শিক্ষার্থীরা বিদ্যার্জনের পরে কী করত সেই ব্যাপারে।

বিদ্যার্জন সমাপ্ত হলে শিষ্যরা স্নান করে এসে গুরুকে প্রণাম করতেন। গুরু তখন তাঁর শিষ্যদের আশীর্বাদ করতেন এবং উপদেশ দিতেন যে তারা যা যা বিদ্যার্জন করেছে তা যেন যথাযথভাবে কাজে লাগায়। ছাত্ররা ওই বিশেষ দিনটিতে বিশেষ উদ্দেশ্যে স্নান করার পর 'স্নাতক' (আজকের দিনে ইংরেজিতে যাকে বলে 'গ্র্যাজুয়েশন' আর স্নান করার পরে গুরুর

দ্বারা ছাত্রদের ওই বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্তির অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'সমাবর্তন' (আজকের দিনে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'কনভোকেশন')। তবে, বর্তমান ভারতের স্নাতক ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান প্রাচীন আমলের স্নাতক ও অনুষ্ঠানের একেবারেই অমিল।

এবার আসি প্রাচীন ভারতের নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে। প্রথমেই বলে নিই, যে যাই বলুন না কেন প্রাচীন ভারতে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার ছিল এবং লিঙ্গ-বৈষম্য বা নারী-পুরুষ ভেদাভেদ বলে কিছু ছিল না, বরঞ্চ প্রাচীন ভারতে নারীদের অতি উচ্চস্থান ছিল। সংগীত, নৃত্যে ও বাদ্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীরা অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। নারীরা বয়ন, সূচিশিল্প ও চারুশিল্প নিয়ে অধ্যয়ন করতেন। ছাত্রীরা গুরুগৃহ থেকে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি পাঠ করত। ভবভূতি তাঁর 'উত্তররামচরিত'-এ লিখেছেন যে আত্রেয়ী বাল্মীকির আশ্রমে লব কুশের সঙ্গে বেদান্ত পড়েছিলেন। তৎকালীন নারীরা অধ্যাপনা এবং পুস্তক রচনাও করতেন এমনকী যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন। আসলে, বৈদিক সমাজে বাল্যবিবাহ বলে কিছু ছিল না। আর অথর্ববেদ থেকে তথ্য পাই যে ছাত্রজীবন শেষ না হলে কুমারীদের বিবাহ করার অধিকার ছিল না। জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে নারীরা ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কিত গূঢ় আলোচনা ও বিতর্কসভায় অংশ নিতেন এমনকী কেউ কেউ মন্ত্রদ্রষ্টাও ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা মন্ত্রের পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষলাভ করেছিলেন। এতটাই উন্নত ছিল প্রাচীন ভারতের নারী সমাজ ও নারী শিক্ষা। আর প্রাচীন ভারতে গার্গী, মৈত্রী, আত্রেয়ীর মতো বিদুষীদের আমরা দেখতে পাই।

নীরস নোটস লিখিয়ে শিক্ষার্থীদের 'তোতাপাখি' তৈরি করা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ধারার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং প্রকৃত শিক্ষার্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিক চরিত্র গঠন লাভ করে, আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাস যাতে বৃদ্ধিলাভ করে, সামাজিক কর্তব্যবোধ যাতে তারা পালন করতে পারে এবং শিল্প-সংস্কৃতির ধারাকে যাতে অব্যাহত রাখতে পারে বা শিল্প-সংস্কৃতি যাতে তাদের হাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ইত্যাদি সব বিষয় নজর দেওয়াও শিক্ষারই নিরবচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে ধরা হতো। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থীরা যে মনুষ্যত্বলাভ এবং সুচরিত্র লাভ করেছিল তা ভারতের নানা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনিতে তো পাওয়াই যায় এমনকী বিদেশি পর্যটকদের রচনাতেও তা প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ হিসেবে দেখতে পাই যে, খ্রিস্টপূর্বাব্দে যেসব স্বনামধন্য বিদেশি পর্যটকরা এসেছিলেন যেমন মেগাস্থিনিস, পিলনি, স্টাবো তাঁদের কথায় ভারতীয়রা সাধারণত মিথ্যা কথা বলতো না, ওই সময় চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না বললেই হয়, একে অপরের প্রতি ছিল অটুট বিশ্বাস আর এসবের জন্যই হয়তো কোনোরূপ মামলা-মোকদ্দমার বিষয় ছিল না। পরবর্তীকালে সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ এবং তারও পরের ই-ভসিঙ্ দুজনেই ভারতীয়দের নৈতিকতার বা নৈতিক জীবন-যাপনের প্রশংসা করে গেছেন। শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সমস্ত বিদেশি পর্যটকরা ভারতীয়দের নীতিবোধ, আচার-আচরণ ও চরিত্র সম্পর্কে প্রশংসা করেছিলেন। এমনকী ঊনবিংশ শতাব্দীতে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেছিলেন, "I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage and therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their selfesteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation"।

ইতিহাস ঘেঁটে আমরা হলফ করে বলতেই পারি যে প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন এবং সাহিত্য-সহ বিদ্যার সমস্ত বিভাগে যে বিপুল উন্নতিলাভ করেছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর। প্রাচীন ভারতে এমন সব বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসক, যোদ্ধা, সাহিত্যিক ইত্যাদি দিক্‌পালদের পেয়েছিলাম যা সত্যিই আমাদের তাক লাগিয়ে দেয় এবং এটা স্পষ্টভাবে বোঝাই যায় যে পৃথিবীর কোনো দেশই প্রাচীন ভারতের মতো এত উন্নত ছিল না। যতগুলি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সভ্যতা ছিল তাদের মধ্যে উন্নত। বিভিন্ন বিষয় বা শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের কৃতিত্ব বা অবদান সম্পর্কে বলতে গেলে গোটা একটা বৃহৎ পুস্তক রচিত হলেও তা হয়তো শেষ হবে না। একাধিক বিষয়ে অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিও বিরল নয় প্রাচীন ভারতে। এই প্রাচীন ভারতবর্ষেই আমরা দেখেছি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইসব শিক্ষপ্রতিষ্ঠানগুলি, বলাবাহুল্য, বর্তমান দেশের এমনকী বিশ্বেরও তাবড় তাবড় নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়কেও হার মানাতে পারে। প্রাচীন ভারতের এই সর্বিক উন্নয়নের পেছনে নিঃসন্দেহে রয়েছে সে সময়ের শিক্ষাপদ্ধতি যা এতই সুপরিকাঠামো যুক্ত, সুচিন্তিত ছিল যে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তা দেখা যায়নি এবং আজও হয়তো দুর্লভ। আর এই প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাই গত শতাব্দীর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবলভাবে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন শহরের রুক্ষ চার দেওয়ালের আবদ্ধে শিক্ষাদান নয়, এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের মতো প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের এক মিলন ঘটানো। আজ, এত নামি-দামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্জন করে কতজন পারছি নিজেদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে? বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাই বা আমাদের কতটা চরিত্রবান করে তুলছে বা নৈতিকতায় ভরিয়ে দিচ্ছে? গুরু-শিষ্যের সেই পিতা-পুত্রের মতো সম্পর্কটা আদৌ আছে কী? সব গুরুই কি আজ সমান শ্রদ্ধাশীল বা সবাই কি শিষ্যের প্রকৃত নৈতিক বন্ধু হয়ে উঠতে পারছেন? গরিব শিক্ষার্থীদের বিনা পয়সায় শিক্ষা ক'জন দিচ্ছেন? এইসব বিষয়গুলো নিয়ে যতই ভাবি ততই আমরা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠি। আর এর সঙ্গে এক প্রবল বিস্ময়ও আমাদের মনকে গ্রাস করে। আর ঠিক তখনই আমরা ফিরে যেতে চাই প্রাচীন ভারতের এক শিক্ষাপ্রাঙ্গণে, প্রকৃতির মাঝে কোনো এক আশ্রমে, এক সদ্‌গুরুর কাছে নিজেদের অর্জিত বিদ্যা প্রয়োগ করতে। আর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে এক পরম শান্তিলাভ করতেও চাই। সর্বোপরি মানুষের মতো মানুষ হতে চাই যে! ■

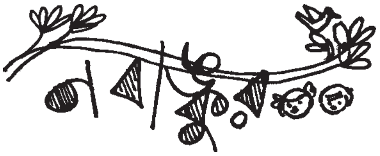

# মিথ্যা বড়াই ভালো নয়

সমুদ্রের তীরে কোনো এক নগরে এক ধনী ব্যক্তি বাস করত। তার ছেলে একটা কাক পুষেছিল। প্রতিদিন সে নিজের পাতের খাবার কাকটাকে খেতে দিত। তার পাতের সুস্বাদু আর পুষ্টিকর এঁটো খাবার খেয়ে কাকটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কাকের এজন্য খুব গর্ব। সে তার থেকে শ্রেষ্ঠ পাখিদেরকও তুচ্ছ জ্ঞান করতে আর অপমান করতে আরম্ভ করল।

একদিন সমুদ্রের ধার অন্য জায়গা থেকে কতকগুলো হাঁস উড়ে এসে নেমেছিল। সেই ধনী ব্যক্তির ছেলেটি সুন্দর হাঁসগুলোর খুব প্রশংসা করতে লাগল। কাকটির কিন্তু এসব সহ্য হলো না। তখন কাকটি ওই হাঁসগুলির কাছে গিয়ে যে হাঁসটি বেশি সুন্দর তাকে বলল— আমি তোমাদের সঙ্গে বাজি রেখে উড়তে চাই। হাঁসেরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল— ভাই, আমরা তো দূরদূরান্তে উড়ে বেড়াই। এখান থেকে বহু দূরে মানস সরোবরে থাকি। আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তোমার কী লাভ? তুমি হাঁসেদের সঙ্গে কী করে উড়তে পারবে?

কাক গর্ব করে বলে উঠল— আমি একশো রকম ওড়বার কায়দা জানি আর এক এক কায়দায় একশো যোজন পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারি। উড্ডীন, অবডীন, প্রডীন, ডীন ইত্যাদি বহুরকম কায়দাওয়ালা গতির কথা বাক্যবাগীশ কাক হাঁসেদের

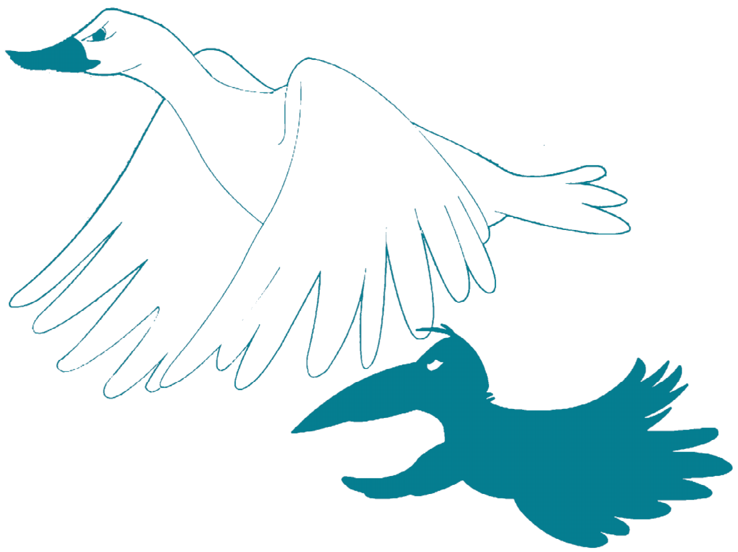

গুনে গুনে শুনিয়ে বলল— 'বলো তোমরা এসব গতির কোনটায় উড়তে চাও?।'

তখন হাঁসেদের দলপতি বলল— 'কাক, তুমি তো খুব কুশলী বটে। কিন্তু আমি তো একটিমাত্র কায়দা জানি যা সব পাখিই জানে। আমি ওই কায়দাতেই উড়ব।' অহংকারী কাকের গর্ব আরও বেড়ে গেল। সে বলল— ' ঠিক আছে, তুমি যে গতি জানো তাতেই আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেখাও।'

সেই সময় আরও কিছু কাক ও অন্যান্য পাখি সেখানে এসে হাজির হলো। তাদের সামনেই কাক আর হাঁসেদের দলপতি দুজনে সমুদ্রের দিকে উড়ে চলল। সমুদ্রের উপরে শূন্যে কাকটা নানারকম কৌশল দেখাতে দেখাতে পুরোদমে গভীর সমুদ্রের দিকে উড়তে থাকল এবং হাঁসটার থেকে অনেক এগিয়ে গেল। হাঁস তার স্বাভাবিক ধীর গতিতে উড়ে যাচ্ছিল। এই দেখে পাড়ে গাছে বসে থাকা অন্য কাকগুলো খুশিতে ডগমগ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই কাকের পাখা ধরে এল। সে অবসন্ন হয় পড়ল। এধার-ওধার চাইতে লাগল কোথাও কোনো গাছ দেখতে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু এই অসীম সমুদ্রে জল ছাড়া তে আর কিছুই দেখতে পেল না। ইত্যবসরে উড়তে উড়তে হাঁসটি তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। কাকটি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ফলে উঁচু উঁচু ঢেউ আর ভয়ংকর জলজন্তুতে ভরা সমুদ্রের ওপরে আছড়ে পড়ার মতো অবস্থা হয়ে গেল তার।

কাকের এই অবস্থা দেখে হাঁসটি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল— 'তোমার ঠোঁট আর পাখা জল স্পর্শ করতে শুরু করেছে। এ তোমার কোন গতি?' হাঁসের ব্যঙ্গভরা কথা শুনে কাক খুব করুণভাবে বলল— 'ভাই হাঁস, আমরা কাকেরা শুধু কা কা করতে জানি। আমাদের কি এত দূরে ওড়া চলে। আমার বোকামির শাস্তি আমি পেয়ে গেছি। তুমি ভাই দয়া কররে আমার প্রাণ বাঁচাও।' বলতে বলতেই কাক সমুদ্রের জলে পড়ে গেল।

জলে ভেজা, অচেতনপ্রায় আর আধমরা কাকটার ওপর হাঁসের দয়া হলো। সে তাকে নিজের পিঠে চাপিয়ে নিল। তারপর তারা যেখান থেকে ওড়া শুরু করেছিল সেখানে ফিরে এল। হাঁস শুধু একটি কথাই বলল— 'মিথ্যা বড়াই ভালো নয়।' হাঁসেরা আবার যেখান থেকে এসেছিল সেদিকে উড়ে চলল।

**শম্ভুনাথ পাঠক**

## ভারতের পথে পথে

# গোমুখ

গঙ্গোত্রী থেকে ১৮ কিলামিটার দূরে ৪২৫৫ মিটার উচ্চে ভাগীরথী পাহাড়র পাদদেশে গাড়োয়াল হিমালয়ের বৃহত্তম হিমবাহ গোমুখ। এখান থেকে তুষার ঝলমল ভৃগু পর্বত দেখা যায়। এখানে পায়ের নীচে বরফ, আশেপাশে বরফ, চারপাশে শুধু বরফ। এখানে প্লাস্টিক নিয়ে যাওয়া বারণ। চৌখাম্বা পর্বতের পশ্চিম ঢাল বেয়ে এখানে শেষ হয়েছে গোমুখ হিমবাহ। হাজার ফুট নীচে গ্লেসিয়ার পয়েন্ট। গঙ্গা এখানে প্রচণ্ড বেগবতী, নাম ভাগীরথী। এই হিমবাহের তিন দিকে তিনটি তীর্থস্থল— ব্রহ্মতীর্থ গঙ্গোত্রী, বিষ্ণুতীর্থ বদরীবিশাল এবং শৈবতীর্থ কেদারনাথ। দুঃখের বিষয়, বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে প্রতি বছর ১৮ মিটার করে এই হিমবাহ পিছিয়ে যাচ্ছে। সমীক্ষকদের মতে, এই হারে গলন চললে ২০৩৫ সালে বিলীন হয়ে যাবে এই গ্লেসিয়ার পয়েন্ট। এখানে রংবেরঙের পাথর, পাহাড়ি ফুল ও হিমালয়ের ভুবনমোহন রূপ পর্যটকদের পাগলপারা করে তোলে।

## জানো কি?

- ভারতের সবচেয়ে বড়ো নদী বদ্বীপ অসমে ব্রহ্মপুত্র নদের মাজুলী।
- সবচেয়ে ছোটো অসমে ব্রহ্মপুত্র নদের উমানন্দ।
- ভারতের সবচেয়ে অধিক ঘনত্বের জনবসতি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।
- সবচেয়ে অধিক জনসংখ্যার শহর কলকাতা।
- সবচেয়ে বড়ো হ্রদ কাশ্মীরের উলার হ্রদ।
- সবচেয় বড়ো শিবলিঙ্গ মধ্যপ্রদেশের ভোজপুরে।
- সবচেয়ে বড়ো শিবমন্দির অসমের শিবডোল।

## ভালো কথা

# শিশুদিবস

গত ১৪ নভেম্বর শিশুদিবসে আমাকে আমাদের স্কুল থেকে জওহরলাল নেহরুর ওপর ভাষণ তৈরি করতে বলা হয়েছিল। সেই মতো আমি মা ও বাবার কাছ থেকে জেনে নিয়ে ভাষণ তৈরি করেছিলাম। আমার বন্ধুরাও তৈরি করেছিল। সেদিন আমরা একে একে ভাষণ দিলাম। তারপর আন্টিরা আমাদের কাগজের প্যাকেটে টিফিন দিলেন। আমরা খুলে দেখলাম একটি আপেল, একটি চকোলেট ও একটি কেক। আমরা বসে বসে এগুলি খেলাম। তারপর ম্যাম এসে বললেন সবাই লাইন দিয়ে নীচে চল। আমি প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। ম্যামকে জিজ্ঞাসা করলাম কী হবে? ম্যাম বললেন, ঠিক বুঝতে পারবে। নীচে গিয়ে দেখলাম সবাইকে একটি করে চারাগাছ দেওয়া হচ্ছে। চারাগাছ হাতে সবার ছবি তোলা হলো। চারাগাছ পেয়ে সবাই খুব খুশি হলাম। মহা আনন্দে আমরা একে অপরের চারা দেখতে লাগলাম। বাড়িতে এলে বাবা বলল এটা গন্ধরাজ ফুলের চারা। আমার আরও আনন্দ হলো। বাবা একটা বড়ো টবে চারাটি লাগিয়ে দিল। আমি ঠিক করলাম প্রতিদিন গাছটিতে জল দেব আর যত্ন নেব।

**আরাত্রিকা মিশ্র, তৃতীয়শ্রেণী, জিলা পাবলিক স্কুল, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## কবিতা

# শীতের বুড়ি

**শ্রেয়া সেন,** নবমশ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

ধীরে ধীরে গুড়ি গুড়ি–
আসছে ভাই শীতের বুড়ি।
শীতের বুড়ি বড়োই ভালো
ঠাণ্ডা বাতাস মিষ্টি আলো।

শীতের বুড়ি ঋতুর রানি
একথা তো সবাই মানি।
শীতের বুড়ি দুঃখ তাদের
বাড়িঘর নেইকো যাদের।

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

## ।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১৫।।

# পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি ভীতির সত্য মিথ্যা

**দেবযানী ভট্টাচার্য**

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ কি এনআরসি'র ভয়েই বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়েছেন? নিছক ইলেকশন ডেটা কিন্তু অন্য কথা বলছে। তাহলে মাত্র ছ'মাস আগে যে কালিয়াগঞ্জে বিজেপি ৫৭, ০০০ ভোটের লিড পেয়েছিল, সেখানে তারা প্রায় ২,৫০০ ভোটে হেরে গেল কেন? কারণ লোকসভা ভোটের বিচার্য বিষয়, প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের প্রতি সাধারণ ভোটারের পছন্দ অপছন্দ বিধানসভা ভোটের থেকে আলাদা হয়।

ইলেকশন ডেটা বলছে, সীমান্তবর্তী হওয়া সত্ত্বেও কালিয়াগঞ্জ ও করিমপুরে এনআরসি ভীতির প্রচার তেমন দাগ কাটতে পারেনি। মানুষ তত ভয় পাননি। এটি জানা কথা যে, রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী দুইয়েরই আধিক্য। অতএব সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে তৃণমূলের এনআরসি ভীতির প্রদর্শন ও অপপ্রচার অধিকতর ফলদায়ী হওয়ার কথা। সীমান্তের মানুষের এনআরসি নিয়ে বেশি ভয় পাওয়ার কথা এবং এনআরসি করার প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য বিজেপিকে বেশি করে প্রত্যাখ্যান করার কথা। কারণ ছিন্নমূল মানুষের নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। সাধারণ অনুমান এটিই এবং কালিয়াগঞ্জ ও করিমপুরে বিজেপির পরাজয়ে রাজ্যে সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ ধরেই নিয়েছেন যে এনআরসি'র কারণেই সম্ভবত এই হার। বিশেষত কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপির হারকে বিজেপি সমর্থকদের এক বৃহৎ অংশ তো এনআরসি ভীতির কারণে পরাজয় বলেই ধরে নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব হলো, এই তৈরি করা এনআরসি ভীতি কালিয়াগঞ্জ ও করিমপুরের মানুষকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। ভোটের ফলাফল স্পষ্ট দেখাচ্ছে যে এইসব অঞ্চলের মানুষ হয়তো ভয় দেখানো সত্ত্বেও এনআরসি নিয়ে তত ভয় পাননি। বরং এই দুটি কেন্দ্রে বিজেপির ফল ২০১৬-র তুলনায় ঢের ভালো। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে যেখানে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী দুইয়েরই আধিক্য, সেখানকার মানুষ এনআরসি'র অধিক বিরোধিতা করবেন এবং এনআরসিকে বেশি করে এড়িয়ে যেতে চাইবেন; উপনির্বাচনের ফলাফল কিন্তু এমন অনুমানকে সমর্থন করছে না।

সাধারণ বিজেপি সমর্থক গত মে মাসে লোকসভা ভোটের ফলাফলের সঙ্গে এই উপনির্বাচনের ফলাফলের তুলনা করছেন এবং বেশ খানিক উদ্বিগ্ন ও হতাশ হচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব হলো, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বিধানসভা ভোটের ফলাফল তুলনা করতে যাওয়া সামগ্রিকভাবে অনুচিত, পদ্ধতিগতভাবে ভুল এবং মিসলিডিং বা বিভ্রান্তিকর। লোকসভা ভোটে মানুষ ভোট দিয়েছিলেন দিল্লিতে মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার গঠিত হবে কী হবে না তা নির্ণয় করতে। সেই বিপুল জনমত ছিল মোদীজীর পক্ষে। তাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদীকে জেতাতে। বিশেষত ফ্লাইং ভোটাররা। এই ফ্লাইং ভোটাররা এও জানেন যে রাজ্যের উপনির্বাচনে তৃণমূলকে হারালে শাসকদলের রোষের মুখে পড়তে হতে পারে তাঁদের, কারণ উপনির্বাচনে বিজেপি জিতলেও রাজ্যে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই থাকবেন এবং যে বিধানসভা কেন্দ্রে হারবেন, সেই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের জেলার ভোটাররা মূলত শাসকদলের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন। একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষও 'দিল্লি ভোট' আর 'রাজ্য ভোট' তফাত করতে জানেন। তাঁরা প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট তখনই দেন যখন বুঝতে পারেন যে তাঁদের ভোট পটপরিবর্তন ঘটাবে। তাই উপনির্বাচনে তাঁরা বিজেপিকে জিতিয়ে শাসককে চটানোর চেষ্টা করেননি।

সেই কারণে ২০১৯-এর বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ ও তুলনা যদি করতেই হয়, তাহলে ২০১৯-র লোকসভা ভোটের ফলাফলের সঙ্গে নয়, বরং ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে তা করাই যুক্তিযুক্ত। তাই, যদিও একথা সত্যি যে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপির যে ফলাফল হয়েছিল, সেই তুলনায় এই উপনির্বাচনে তা খারাপ, কিন্তু তার অর্থ এই

নয় যে এই উপনির্বাচনে কালিয়াগঞ্জের মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখান করেছেন।

২০১৬ কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রমথনাথ রায়। পেয়েছিলেন ১,১২,৮৬৮ টি ভোট। তৃণমূলের বসন্ত রায় পেয়েছিলেন ৬৬, ২৬৬টি ভোট আর বিজেপির রূপ রায় ২৭, ২৫২ টি ভোট। ওই বছর এই বিধানসভায় মোট ভোট পড়েছিল ২,১৪,৬৪২টি। সেই তুলনায় ২০১৯-এর উপনির্বাচনে তৃণমূলের তপন দেব সিংহ পেয়েছেন ৯৭,৪২৪টি ভোট আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির কমলচন্দ্র সরকার ৯৫,০১৪টি ভোট। কংগ্রেসের ধীতশ্রী রায় ১৮,৮৫৭ টি ভোট। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় মোট ভোট পড়েছে ২,১৮,২০০ টি।

অর্থাৎ ২০১৯-এ এই বিধানসভায় কংগ্রেসের ২০১৬-র ভোট ভাগ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ কংগ্রেসের ভোট কমেছে (১, ১২,৮৬৮ – ১৮,৮৫৭) = ৯৪,০১১টি। যদি ধরে নেওয়া হয় যে এতগুলি ভোট বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়েছে, তাহলে তৃণমূল ও বিজেপি, উভয় দলেরই এ বছরে ভোট বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল প্রায় (৯৪,০১১/২) = ৪৭,০০৫ টি করে। কিন্তু বাস্তবে ২০১৯ সালের এই উপনির্বাচনে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে (৯৫,০১৪ – ২৭,২৫২) = ৬৭,৭৬২টি আর তৃণমূলের ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে (৯৭,৪২৪ – ৬৬,২৬৬) = ৩১,১৬২টি। অর্থাৎ ২০১৬ থেকে ২০১৯-এ তৃণমূল ও বিজেপির ভোট সমানভাবে বৃদ্ধি পায়নি। বরং বিজেপির ভোট বেড়েছে অনেক বেশি। তুলনামূলক ফলাফল দেখলে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে কালিয়াগঞ্জে তৃণমূলের ভোট যতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, বিজেপির ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে তার (৬৭,৭৬২/৩১, ১৬২) = ২.১৭ গুণ, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বিজেপির ফল তৃণমূলের চেয়ে ভালো হয়েছে, কালিয়াগঞ্জের প্রচুর মানুষ বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও জয় হয়েছে তৃণমূলেরই।

সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত কিছু ডেটা অনুযায়ী মে মাসে লোকসভা ভোটে শুধু কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায়ই বিজেপি পেয়েছিল ৫৭,০০০ ভোটের লিড। আর উপনির্বাচনে সেখানে বিজেপি হেরেছে (৯৭,৪২৮ – ৯৫,০১৪) = ২,৪১৪ ভোটে। লোকসভা নির্বাচনে কোনো একটি বিশেষ বিধানসভা অঞ্চলে ভোটের ফলাফল ঠিক কেমন হয়েছে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ইলেকশন ডেটা থেকে তা সরাসরি জানবার বোধহয় কোনো উপায় নেই। কারণ লোকসভা ভোটে নির্বাচন কমিশন বিধানসভাভিত্তিক কোনো ডেটা প্রকাশ করছে বলে কোথাও খুঁজে পাইনি। তাই মে মাসের লোকসভা নির্বাচনে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি যে ৫৭, ০০০ ভোটের লিড নিয়েছিল বলে শোনা যাচ্ছে, সে তথ্য অফিসিয়ালি কোনোখানে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এ বোধহয় কেবলমাত্র কিছু সংবাদমাধ্যমের বা রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী এজেন্টদের এম্পিরিকাল অ্যাসেসমেন্ট।

এই উপনির্বাচনের তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ লোকসভার অর্ন্তগত কালিয়াগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত করিমপুর, এই দুটিই হলো সীমান্তবর্তী অঞ্চল। কালিয়াগঞ্জের মানুষ যদি সত্যিই এনআরসি ভীতির শিকার হতেন, তাহলে ২০১৬ বিধানসভার তুলনায় এত বেশি মানুষ এ বছর বিজেপিকে ভোট দিতেন কি? বোধ হয় না। ২০১৬ থেকে ২০১৯-এ কালিয়াগঞ্জে বিজেপির ভোট বেড়েছে ৬৭, ৭৬২ টি। ভয়ভীতি থাকলে এত ভোট বৃদ্ধি পেত না, বরং আরো অনেক বেশি ক্ষতি হতো বিজেপির। অথচ তা হয়নি, বরং এ বছর তৃণমূল কালিয়াগঞ্জ জিতেছে মাত্র ২, ৪১৪টি ভোটের ব্যবধানে। একথা সত্য যে কালিয়াগঞ্জের বেশকিছু মানুষ যাঁরা লোকসভায় বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, বিধানসভায় তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এই সকল ভোটাররের এমত মন পরির্তনের কারণ সম্ভবত এনআরসি ভীতি নয়। বরং ফ্লাইং ভোটাররা উপনির্বাচনে সচেতনভাবে শাসকদলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং এটি বিজেপির পরাজয়ের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। আবার লোকসভা ভোটের ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে তৃণমূলও এলাকার স্থানীয় ইস্যুগুলোতে যত্নসহকারে নজর দিয়েছে এবং মানুষের কাছাকাছি পৌঁছেছে, সেটিও বিজেপির পরাজয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ফ্লাইং ভোটাররা তাতেই আবার তৃণমূলের দিকে ঢলেছেন এবং নির্বাচনের ফলাফলও তাতে বদলে গিয়েছে। এনআরসি ভীতির ভূমিকা এরমধ্যে কতটুকু আছে বা আদৌ আছে কিনা তা জানতে গেলে পৃথক সমীক্ষার প্রয়োজন।

এবার দেখা যাক্, করিমপুরের তুলনামূলক চিত্র।

২০১৬-তে করিমপুর বিধানসভায় জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। পেয়েছিলেন ৯০,৯৮৯টি ভোট। সিপিএমের সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ পেয়েছিলেন ৭৫,০০০ ভোট আর বিজেপির শুভাশিস ভট্টাচার্য (আনন্দ) ২৩,৩০৩টি ভোট। ঐ বছর এই বিধানসভায় মোট ভোট পড়েছিল ২,০১, ১০৬টি। সেই তুলনায় ২০১৯-এর উপনির্বাচনে তৃণমূলের বিমলেন্দু সিংহ রায় পেয়েছেন ১,০২,২৭৮ টি ভোট আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির জয়প্রকাশ মজুমদার ৭৯,৩৬৮টি পেয়েছেন। সিপিএমের গোলাম রাব্বি পেয়েছেন ১৮, ৬২৭টি ভোট। এ বছর করিমপুর বিধানসভায় মোট ভোট পড়েছে ২,০৪, ৮০৫টি। অর্থাৎ এই বিধানসভায় আদতে কমেছে সিপিএমের ভোট এবং তার অধিকাংশই গিয়েছে বিজেপির খাতায়। ২০১৬ র তুলনায় সিপিএমের ভোট কমেছে (৭৫,০০০ – ১৮৬২৭) = ৬৫,৩৭৩টি আর বিজেপির ভোট ২০১৬-র তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (৭৯,৩৬৮ – ২৩,৩০৩) = ৫৬, ০৬৫ টি। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই কেন্দ্রে সিপিএমের যে কটি ভোট কমেছে, তার প্রায় সবগুলিই গিয়েছে বিজেপিতে। অর্থাৎ গত ১২০১৬-র বিধানসভায় বিজেপির যা ফল হয়েছিল, সেই তুলনায় এ বছরের উপনির্বাচনে করিমপুরে বিজেপির

ফল ভালো হয়েছে। ২০১৬-র তুলনায় এ বছর বিজেপি ৫৬,০৬৫টি ভোট বেশি পেয়েছে।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ বছরের উপনির্বাচনের তিনটি বিধানসভার মধ্যে একমাত্র করিমপুরেই ২০১৬তে সিপিএমের কিছু ভোট ছিল যা এবার তলানিতে ঠেকেছে। মুসলমান প্রার্থী গোলাম রাব্বিকে করিমপুরের বাম সমর্থকরা তেমন গ্রহণ করেননি। তবে কি সিপিএমের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সীমান্তবর্তী করিমপুর প্রত্যাখ্যান করেছে? তৃণমূলের খাতায় ২০১৬-র তুলনায় এবছর বৃদ্ধি পেয়েছে (১,০৩,২৭৮ – ৯০,৯৮৯) = ১২,২৮৯টি ভোট। এবছর এই বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়তি ভোট পড়েছে মাত্র (২,০৪, ৮০৫ – ২,০১,১০৬) = ৩,৬৯৯ টি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই নতুন ভোটগুলির সবই গিয়েছে তৃণমূলের খাতায়, তা সত্ত্বেও তৃণমূলের ভোট ২০১৬-র তুলনায় ২০১৯-এ বৃদ্ধি পেয়েছে আরও ১২,২৮৯ – ৩,৬৯৯) = ৮,৫৯০টি। এই ভোটগুলি অন্য নানা প্রার্থীদের থেকে তৃণমূলের খাতায় গিয়েছে বলে অনুমান করা যায়। অর্থাৎ তুলনামূলক দেখতে গেলে করিমপুরেও বিজেপির ফল খারাপ হয়নি, কিন্তু তৃণমূলের ফল হয়েছে আরও অনেক ভালো। তারা কনসলিডেট করেছে আরও মনোযোগ সহকারে। এ থেকে এও স্পষ্ট যে বুথ লেভেল থেকে প্রতিটি ভোটার এবং তাদের নির্বাচনী পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছে তৃণমূল। নচেৎ এমন কনসলিডেশন অসম্ভব ছিল।

করিমপুরের সিপিএম ভোট বিজেপির খাতায় আসা থেকে এও বোধ হয় প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ধর্মীয় মেরুকরণের চোরাস্রোত বইছেই। গোলাম রাব্বিকে ভোট দিতে হয়ত তাঁরা রাজি হননি। তাছাড়া এনআরসি'র বিরোধিতা সিপিএমের দিক থেকেও তীব্রভাবে হয়েছে। কিন্তু ২০১৬ সিপিএমের ভোটের (৫৬,০৬৫/৭৫,০০০) = প্রায় ৭৫% ২০১৯-এ বিজেপিতে চলে যাওয়ায় এটা স্পষ্ট যে সিপিএমের এনআরসি বিরোধিতা এবং তাদের প্রার্থী গোলাম রাব্বি উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছেন করিমপুরের সিপিএম সমর্থকরা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ এর আনন্দবাজার পত্রিকার একটি খবর, যা উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একেবারেই মিলে যায়। আনন্দবাজারের খবর অনুযায়ী, করিমপুরের সিপিএমের নেতাকর্মীদের একটা বড় অংশ এখন বিজেপিতে। ২০১৬ করিমপুরের সিপিএম প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষও বিজেপিতে, এমনকী সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাত্ত্বিক নেতা অনিল বিশ্বাসের করিমপুরবাসী পরিবারের অধিকাংশ সদস্যও বর্তমানে বিজেপিতে। ভোটের ফলাফলও এই তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভোটের ফলও দেখাচ্ছে যে করিমপুরে বিজেপি টেনেছে সিপিএমের ভোট, তৃণমূলের ভোটে দাঁত ফোটতে পারেনি, বরং বুথভিত্তিক জনসংযোগের মাধ্যমে তৃণমূল কনসলিডেট করেছে। ছোটখাটো নানা দলের প্রার্থীর ভোটও টেনেছে নিজের দিকে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এনআরসি ভীতির প্রচার করিমপুরের মানুষকেও তেমন স্পর্শ করেনি। ভোট হয়েছে স্থানীয় মানুষের স্থানীয় ইস্যুর নিরিখে।

কারণ সম্ভবত এই যে এখানকার বহু মানুষ যেহেতু আদতেই শরণার্থী এবং নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার যন্ত্রণা বোঝেন, পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ইসলামিক নির্যাতনের প্রকৃতি আদতে কতখানি ভয়াবহ তা জানেন এবং নিজেদের শরণার্থী স্টেটাস সম্বন্ধে অবগত, সেইজন্যই তা নথিভুক্ত/পঞ্জীকরণ করানোর জন্য অর্থাৎ এনআরসি'র জন্য তাঁরা হয়তো মানসিকভাবে প্রস্তুত। তাই এনআর সি-কে ভয়ও পান না। যাঁরা এমনিতেই নিরাপত্তাহীন, তাঁদেরকে আরও বেশি ভয় দেখানো যায়নি। বরং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা মানুষকে আরও বেশি ভয় পাইয়ে দেওয়ার অমানবিক অপপ্রয়াস তৃণমূলের দিক থেকে হওয়াটাই অবাঞ্ছনীয় ছিল।

তাছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ হয়তো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্বন্ধেও কিছুটা সচেতন এবং জানতে পেরেছেন যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ না করে এ রাজ্যে এনআরসি হবে না। সেই কারণেই হয়তো বর্ডার নিকটবর্তী বিধানসভাগুলিতে তৃণমূলের তরফ থেকে এনআরসি ভীতির প্রচার যদি হয়েও থাকে, তা সত্ত্বেও তা তৃণমূলের জন্য বড় একটা ফলদায়ী হয়নি এবং সেই কারণেই এই দুটি বিধানসভায় বিজেপির ফল তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত ভালো। এবং এই একই কারণে সিপিএমের গোলাম রাব্বিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সিপিএমের ভোটাররাও।

এইসব কেন্দ্রগুলির লোকাল ইস্যুগুলি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে এই দুটি কেন্দ্রের বিজেপির পক্ষে তৃণমূলকে টপকে যাওয়া যথেষ্ট সহজ ছিল। কিন্তু লোকাল ইস্যু নিয়ে বিজেপি তেমন কাজ করেনি বলেই মনে হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পর এনআরসি করলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মানুষের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা যায়।

সীমান্ত থেকে দূরে, বিশেষত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে এনআরসি সম্বন্ধে যে অপপ্রচার হয়েছে তা যথাসময়ে খণ্ডন করা হয়নি। অপপ্রচারের গতিবেগ ক্রমশ বেড়েছে, প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে তা করার প্রয়োজন পড়বে এবং এনআরসি যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো নাগরিককেই তার নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তৈরি হবে না সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক প্রচার প্রয়োজন।

তার জন্য বিজেপিকে তেমন বক্তাকে নিয়ে জনসভা করতে হবে, যাঁরা এনআরসি কী, কেন, কী তার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বুঝবেন এবং সাধারণ মানুষকে সাধারণ মানুষের ভাষায় তা বুঝিয়েও দিতে পারবেন। সারা দেশে এনআরসি যে অসম এনআরসি'র মেথডোলজি বা পদ্ধতি অনুযায়ী হবে না, সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে হবে যাতে মানুষের হয়রানি হবে না, এ নিয়ে ধারাবাহিক প্রচারের পরিকল্পনা, স্লোগান ও রূপরেখা তৈরি করার প্রয়োজন আছে। ▌

# উপনির্বাচনেও উন্নয়নবাহিনীর তাণ্ডব

রণিতা সরকার

রাজ্যের একটি সাধারণ উপনির্বাচন, তাতেও পশ্চিমবঙ্গবাসী যে ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী থাকল তা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বহু চর্চিত বিষয় হয়ে থাকবে। রাজ্যবাসী সেদিন প্রত্যক্ষ করল কীভাবে একজন বিধায়ক পদপ্রার্থীকে চরম শারীরিক হেনস্থার স্বীকার হতে হয়েছে। নদীয়ার করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারের দোষ ছিল তিনি ছাপ্পা ভোটের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘিয়াঘাট ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েন, আর তাতেই তৃণমূলের উন্নয়নবাহিনীর গোঁসা হয়। বাকিটা সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে সকলের

জানা। সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রার্থী অভিযোগ জানাতে শুরু করলেই শুরু হয় উন্নয়নবাহিনীর কিল, চড়, ঘুসি। এবং শেষপর্যন্ত তাকে লুঙ্গিবাহিনী এসে লাথি মেরে ঝোপে ফেলে দেয় ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে।

এবার প্রশ্ন হলো কারা এরা? কার নির্দেশেই বা তাদের এই বাড়বাড়ন্ত? এবং আরেকটি দিকও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নেত্রীর দেখানো পথ অনুসারে যদি সত্যি করিমপুরে উন্নয়ন হয়েই থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের উপর তাদের ভরসা নেই কেন? কেন তারা জোর করে বলপূর্বক ভোট করাচ্ছে?

উন্নয়নের কথায় করিমপুরবাসী কেবলমাত্র উন্নয়নের ফলাফল ইভিএমে পর্যবসিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ওয়ার্ডভিত্তিক সমীকরণ করলে দেখা যাবে পানীয় জল, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে আলোর সুষ্ঠু পরিকাঠামো দিতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিডডে মিলের চরম বেহাল অবস্থা, গ্রামের একশোদিনের কাজের টাকার লুট—এইসব ইস্যুগুলি তো আছেই। কিন্তু নেত্রী যেই মাস্টারস্ট্রোকটিকে কাজে লাগিয়ে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছেন সেটি হলো এই এলাকার মানুষগুলিকে এনআরসি নিয়ে ভয় ধরিয়ে দেওয়া। কার্যত এনআরসি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এলাকার সাংসদ মহুয়া মৈত্র যেভাবে পুলিশ প্রশাসনকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন, যেভাবে আই.সি-কে নিয়ে দলের প্রচার সেরেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করাও ছিল সহজ।

সাধারণভাবে কোনো রাজ্যে উপনির্বাচনে যে সরকার ক্ষমতাসীন, সেই দলের জেতার সম্ভাবনাই প্রবল থাকে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমও থাকে। অতীতেও উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার গঠন করলেও উপনির্বাচনে বিজেপি ভালো ফল করতে পারেনি। তবে পশ্চিমবঙ্গ যে ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী থাকল তার নিন্দার ভাষা নেই। নির্বাচন আসবে যাবে, সরকার গড়বে ভাঙবে কিন্তু একজন নির্বাচনী প্রার্থীকে এহেন শারীরিক নির্যাতন আক্ষরিকভাবেই অনভিপ্রেত। যে রাজনৈতিক দলটির পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি, শিক্ষা, ঐতিহ্য, পরম্পরা নিয়ে এত গলাবাজি, ট্রাফিক সিগন্যালে যারা মানুষকে রবীন্দ্রসংগীত শোনায় তাদের দ্বারাই এহেন আচরণ সমাজকে কী বার্তা দেবে? গাজোয়ারি করে একটি নির্বাচন জেতা যায়, কিন্তু স্বচ্ছতা, সামাজিক সদ্ভাব এগুলির উপর যে কদর্য আঘাত এল তা ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মানুষ স্মরণে রাখবে।

বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারকে এই নিগ্রহের পরেও তৃণমূল সুপ্রিমোর একটি প্রতিক্রিয়া বা একটি ট্যুইট সামনে আসেনি। মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিলে বলা যায় লুঙ্গিবাহিনী আবার এই নির্যাতন চালাবে। একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, যে লাথিটি জয়প্রকাশবাবুর উপর পড়েছে সেটি শুধুমাত্র তার উপর পড়েনি, পড়েছে নেত্রীর লালিত পালিত দুধেল গোরুর দ্বারা হিন্দুদের উপর। রাজ্যে আজ যে হিন্দুরা বিপদের দিকে এগোচ্ছে এই ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সংস্কৃতির উপর যে চরম আঘাত করা হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হিন্দুশক্তি সুদূর ভবিষ্যতে তার জবাব দেবে। তবে তার জন্য সবার আগে দরকার হিন্দুদের মধ্যে থেকে এনআরসি সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করা, স্বচ্ছ ব্যাখ্যা ও নাগরিক সংশোধনী বিল বা সিএবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের বোঝানো। সেকুলারিজমের বিষবাষ্প থেকে বেরিয়ে এসে চোখ খুলে চারপাশটা হিন্দুদের দেখতে হবে, বুঝতে হবে এই রাজ্যটা হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। অস্তিত্বের সংকটে পড়লে অস্তিত্বের জন্য লড়াই বলেও একটা বিষয় আছে..... প্রত্যক্ষভাবে এবার তাদের এটি বুঝতে হবে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে অনুপ্রবেশকারীদের আধিক্য, তাদের নাগরিক তৈরি করতে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত তৎপরতা এবং মূলত কেন তাদের এত তোষণ এই দিকগুলি নিগূঢ়ভাবে বুঝতে পারলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে। ■

# বিএসএফ-এর মিজোরাম ও কাছার ফ্রন্টিয়ারের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** বিশ্বে সর্ববৃহৎ সীমান্ত প্রহরার বাহিনী ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। দেশের পশ্চিম সীমান্তে ভারত-পাকিস্তানের ৩,৩২৩ কিলোমিটার এবং পূর্ব প্রান্তে ভারত- বাংলাদেশের ৪,০৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত বিএসএফ পাহারা দিয়ে থাকে। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পরে ১৯৬৫ সালের পয়লা ডিসেম্বর এই বাহিনী গঠন করা হয়। দেশের সীমানা পাহারা দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য। প্রাথমিকভাবে পদ্মবিভূষণ কে এফ রুস্তমজীর নেতৃত্বে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে বিএসএফ গঠন করা হয়েছিল। সেই সময়ে এই বাহিনীর মাত্র ২৫টি ব্যাটেলিয়ন ছিল। আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৬-তে পৌঁছেছে। পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের গুলি বর্ষণ ও অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো পরিস্থিতির মোকাবিলা এই বাহিনী করে আসছে। আজ সীমান্ত প্রহরার পাশাপাশি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, নকশাল দমন, সুষ্ঠভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এই বিএসএফ বাহিনীর সদস্যরা।

মিজোরাম ও কাছার ফ্রন্টিয়ারের সদর দপ্তর শিলচরের মাসিমপুরে। এই ফ্রন্টিয়ার দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা এবং মিজোরামের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ৪৭১ কিলোমিটার এলাকায় টহল দেয়। এছাড়া, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডে সন্ত্রাসবাদ দমনেও এই বাহিনী সক্রিয়। পাশাপাশি, মণিপুরের ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স ও হাইকোর্ট চত্বরের পাহারাও এই ফ্রন্টিয়ার দিয়ে থাকে। সম্প্রতি অসমে এনআরসি-র ফলে উদ্ভূত আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার মোকাবিলায় এই বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছে।

বিএসএফ-এর এই ফ্রন্টিয়ারের মুখপাত্র ডিআইজি জে সি নায়েক জানিয়েছেন, সীমান্ত এলাকায় নিবিড় প্রহরার মাধ্যমে বর্তমানে এই অঞ্চলে গবাদি পশু চোরাচালানের একটিও ঘটনা ঘটেনি। ২০১৮ সালে ৪৮০টি গবাদি পশুকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। চলতি বছর এ পর্যন্ত সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪৮-এ। বরাক উপত্যকায় অতন্দ্র প্রহরার ফলে ড্রাগ চোরাচালান কমে গেছে। বিগত এক বছরে গবাদি পশু চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকায় ৪৬ জন ভারতীয় ও পাঁচজন বাংলাদেশি দুষ্কৃতীকে বিএসএফ আটক করে। চলতি বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ২,৩০,২৩৯টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ২১৫.২ গ্রাম হেরোইন, ৫১৪ গ্রাম গাঁজা, ১,১৬০টি বিদেশি মদের বোতল-সহ বহু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে এই বাহিনীর মূল লক্ষ্য যেমন সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বন্ধ করা, তেমনই বাহিনীর সদস্যরা মেডিকেল ক্যাম্প, মাদক বিরোধী সচেতনতা শিবির, সীমান্তবর্তী এলাকার তরুণদের বাহিনীতে নিয়োগের আগে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বচ্ছতা অভিযান, গ্রাম দত্তক নেওয়া, রোগীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও বন্যার সময় গ্রামবাসীদের উদ্ধার করে থাকে। এই ভাবে বিএসএফ-এর সদস্যরা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁরা কাছার উপত্যকাকে মাদকমুক্ত করার উদ্দেশ্যে পুলিশ-সহ অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে সাহায্য করে। ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এই বাহিনীর সদস্যরা মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষার জন্য 'জীবন পর্যন্ত কর্তব্য' মন্ত্রে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেছেন।

# সড়ক দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায় সুসংহত সড়ক দুর্ঘটনা তথ্যভাণ্ডার (আইআরএবি) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, অ্যাপ- ভিত্তিক সফট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করা। এর মাধ্যমে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা এবং যে অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটেছে সে জায়গাগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব। ২০১১-১৪ সাল পর্যন্ত ৭৮৯টি এলাকা চিহ্নিত করা গেছে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এর মধ্যে ৬৬০টি জায়গা জাতীয় মহাসড়কের এবং ১২৯টি জায়গা রাজ্য সড়কের অন্তর্গত। ইতিমধ্যেই জাতীয় সড়কের ৩৯৫টি জায়গায় দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আরও ২১৫টি জায়গায় এই প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি এই তথ্য জানিয়েছেন।

# মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষায় ভারতীয় রেল গৃহীত পদক্ষেপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** রেলের পুলিশি ব্যবস্থা রাজ্যের বিষয় হওয়ায় অপরাধ দমন, মামলা নথিভুক্তিকরণ, তার তদন্ত এবং রেলের এলাকা তথা চলন্ত ট্রেনে আইন-শৃঙ্খলারক্ষা রাজ্য সরকারগুলির বিধিবদ্ধ দায়িত্ব। রাজ্যগুলি ওই কাজ জিআরপি ও জেলা পুলিশের মাধ্যমে করে থাকে। এই কাজে জিআরপিকে সহায়তা দেয় রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে রেলের এই মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সরকারি রেল পুলিশ। জিআরপি-র সঙ্গে সমন্বয় রেখে যাত্রী বিশেষ করে, মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে।

যে রুটগুলিতে অপরাধ সাধারণত বেশি হয় সেখানে গড়ে ২,২০০ ট্রেনে জিআরপি-র পাশাপাশি আরপিএফ মোতায়েন থাকে। ১৮২ হেল্পলাইন নম্বরটি ২৪ ঘণ্টাই কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া, ট্যুইটার, ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রেল যাত্রীদের বিশেষ করে, মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। মহিলা কামরায় যাতে পুরুষ যাত্রীরা না উঠতে পারে তার জন্য মাঝেমাঝেই অভিযান চালানো হয়। ধরা পড়লে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে। ২০১৮-য় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪২২ জন এবং ২০১৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত ৮৩ হাজার ১৫৭ জন এই রকম পুরুষ যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মহানগরীগুলিতে যে লেডিজ স্পেশাল ট্রেন চলে তাতে পাহারায় থাকেন মহিলা আরপিএফ। অন্যান্য ট্রেনগুলিতে মহিলা যাত্রীদের জন্য বিশেষ নজর দিতে বলা হয়। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়মিত ঘোষণার ব্যবস্থা আছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ স্টেশনে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়। এরকম স্টেশনের সংখ্যা ২০২-এর বেশি। আরপিএফ-এ মহিলা কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে ৫০১টি রেল স্টেশনে এবং ২,০১৯টি কামরায়। এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। সবকটি নবনির্মিত এমু, মেমু এবং কলকাতার বাতানুকুল মেট্রো কোচে আপৎকালীন টক-ব্যাক সিস্টেম এবং সিসিটিভি নজরদারি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। চালু ১২টি এমু ট্রেনে ও ১৫০টি এমু/মেমু ট্রেনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় ফ্ল্যাশার লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যখন অ্যালার্মের চেন টানা হবে তখন এই লাইট দপ্‌দপ্‌ করবে এবং আলো জ্বলবে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানান রেল মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

# চার ধাম কর্মসূচিতে কেন্দ্রের উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** চলতি অর্থ বছরে চার ধাম কর্মসূচিতে ১,৮৫০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। প্রাথমিকভাবে চার ধাম কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনা ছিল ২০২০-র মার্চের মধ্যে। তবে, প্রধানত দেরি হয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালে মামলা এবং সুপ্রিম কোর্টে এক আবেদনকারীর আর্জির জন্য। এছাড়া, ধারাসু বাঁক থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত ৯৪ কিলোমিটার রাস্তাটি পড়ে ভাগীরথী ইকো-সেন্সেটিভ জোনের অধীনে। তাই, সেখানে কাজ করতে হয় কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক থেকে মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হওয়ার পরই। সুপ্রিম কোর্ট গত ৮ অগাস্টের আদেশে দেওয়ানি আবেদনটি নিষ্পত্তি করে পরিবেশগত এবং অন্যান্য বিষয়ে তদারকির জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে দেয়। এই কমিটিকে চার মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। তাই কর্মসূচি রূপায়ণের তারিখ নির্ভর করছে উচ্চপর্যায়ের কমিটির রিপোর্ট এবং ভাগীরথী ইকো-সেন্সেটিভ জোনের মাস্টার প্ল্যানের অনুমোদনের ওপর।

চার ধাম কর্মসূচির মধ্যে আছে রাস্তা চওড়া করা, ঢালের মুখে দেওয়াল তৈরি করা এবং সেটিকে নানাভাবে সুরক্ষিত রাখা। এছাড়াও, ভূমিধ্বস এবং মাটি বসে যাওয়ার জায়গাগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা। রাস্তা যাতে না ভেঙে যায় তার জন্য রাস্তার ধারে উপযুক্ত ঘাস, গাছপালা বসানো। এইসব ব্যবস্থাই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক এবং প্রকৃতির সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে উত্তরাখণ্ড রাজ্য পূর্ত বিভাগ, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও) এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। প্রতিদিনের দেখভালের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা সরাসরি প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দেবেন সংশ্লিষ্ট রূপায়ণকারী সংস্থাকে। মন্ত্রী স্তরেও এই অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়া, ঠিকাদার সংস্থা সরাসরি দায়বদ্ধ থাকবে কাজের গুণমান রক্ষা, ত্রুটির সংশোধন ও নির্মাণ কাজের পর চার বছর পর্যন্ত প্রকল্পটির দেখভালের জন্য।

# মানবপাচার রুখতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে মানবপাচার রোধ, উদ্ধার অথবা নিখোঁজদের হদিশ পাওয়ার পর নিজের দেশে ফেরত পাঠানো এবং পাচার হওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

এই সমঝোতাপত্রের উদ্দেশ্য : দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও নিবিড় করা এবং মানবপাচার রোধ, উদ্ধার, হদিশ পাওয়ার পর নিজের দেশে ফেরত পাঠানো এবং পাচার হওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা। সব ধরনের মানবপাচার রোধে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে জোরদার করা। সেইসঙ্গে, পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেওয়া ও সহায়তা করা।

পাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত তদন্ত শুরু করা। সেইসঙ্গে, একে অপরের দেশে মানবপাচারের মতো অপরাধ সম্পর্কে সিন্ডিকেট বা সংগঠন গড়ে তোলা। মানবপাচার রুখতে অভিবাসন ব্যবস্থা আরও জোরদার করা এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সহযোগিতা বাড়ানো তথা সংশ্লিষ্ট দেশের মন্ত্রকগুলির বর্তমান মানবপাচার বিরোধী কৌশলগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণ করা।

পাচার রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কর্মীগোষ্ঠী বা টাস্ক ফোর্স গঠন করা। পাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং পাচার হওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা। এই তথ্যভাণ্ডারের তথ্য দুই দেশের মধ্যে আদানপ্রদান করা। দুই দেশের পাচাররোধী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ এবং মানবপাচার রোধ, উদ্ধার, হদিশ পাওয়ার পর নিজের দেশে ফেরত পাঠানো তথা পাচার হওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অভিন্ন পরিচালন প্রণালী প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ।

## ল্যান্ডার বিক্রমকে খুঁজে বের করলেন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** চন্দ্রায়ন-২ সফল না ব্যর্থ তাই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। বিশেষ করে চাঁদে অবতরণের পর ল্যান্ডার বিক্রম রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় বিতর্কটি বেশ দানা বেঁধেছিল। ল্যান্ডার বিক্রমকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো তো নিয়েছিলই, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসাও। কিন্তু এই কাজে সফল হলেন চেন্নাইয়ের কম্পিউটার প্রোগ্রামার এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্মুগা সুব্রহ্মণ্যম। তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে নিল নাসাও। সম্প্রতি ল্যান্ডার বিক্রমের ধ্বংসাবশেষের ছবি প্রকাশ করেছে নাসা। সেখানে একটি জায়গাকে 'এস' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই জায়গাটিকেই নাসার প্রকাশ করা ছবি দেখে চিহ্নিত করেছিলেন সুব্রহ্মণ্যম। টুইটে সেকথা লিখেওছে নাসা। নাসা কৃতিত্ব দেওয়ার পর নিজের টুইটার প্রোফাইল বদলে ফেলেন সুব্রহ্মণ্যম। সেখানে লেখেন, 'আমিই বিক্রমকে খুঁজে পেয়েছি।' নাসার পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের এলওসি ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখে ধ্বংসাবশেষের জায়গাটি নিজের চেষ্টায় খুঁজে বের করেছেন সুব্রহ্মণ্যম। যে জায়গায় বিক্রম ভেঙে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছিল তার থেকে ৭৫০ মিটার দূরে ওই ধ্বংসাবশেষটি তিনি খুঁজে পান।

# সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

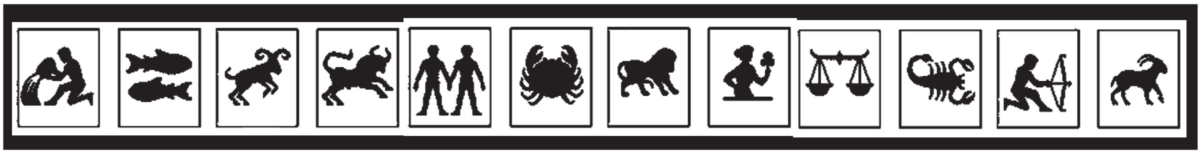

**৯ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ১৫ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, তুলায় মঙ্গল, বৃশ্চিকে রবি, বুধ, ধনুতে বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে ভরণী নক্ষত্র থেকে কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্রে।**

**মেষ :** সন্তানহানি, স্ত্রীঘটিত অশান্তি, রাজকোপ, অর্থ ও বুদ্ধিনাশ। কৃষি ও পশুহানি। মামলা মোকদ্দমা, কর্তব্যে ত্রুটি অসুস্থতায় ভুল চিকিৎসা। পিতৃ সম্পত্তি বিষয়ক ভাই-বোনেদের সঙ্গে সফল আলোচনা। দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতি। প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহচর্যে সিদ্ধি করায়ত্ত হবে। হঠাৎ প্রাপ্তি তবে ভ্রমণ বাতিলে মনঃকষ্ট।

**বৃষ :** স্বজন সম্পর্ক ও পারিবারিক সম্প্রীতির দিকে নজর দিন। কর্মক্ষেত্রে দায়বদ্ধতায় ত্রুটি না হলেও সমালোচিত বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। সন্তানের লেখাপড়ায় সাফল্য অর্জনে গুণী ও সুধীজনের মার্গদর্শন ও আশীর্বাদ লাভ। নতুন গৃহ নির্মাণ ও বাহন যোগ, তবে ব্যবসায় বিনিয়োগে বিরত থাকা শ্রেয়। কুহকিনীর মায়াজালে প্রতারণা। খরচের সীমা সাধ্যের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা।

**মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে দুরূহ সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষের প্রশংসা, নতুন দায়িত্ব বৃদ্ধি। স্বর্ণ, রত্ন, ঔষধী, বস্ত্র, খেলনা ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বিনিয়োগে প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ। ললিতকলা, ভাস্কর্য, সৌন্দর্য্য সুধায় জীবনসঙ্গীর প্রত্যয় দীপ্ত পথচলা ও অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। পেশাদারদের ব্যস্ততা বৃদ্ধি ও সন্তানের অতিরিক্ত আবেগ প্রবণতায় উদ্বেগ। গুরুদায়িত্ব কাউকে দিলে অনুতাপ অনুশোচনায় পড়তে হবে।

**কর্কট :** অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, দক্ষতায় প্রতিভার স্ফুরণ, কর্মদক্ষতা ও চিন্তা-চেতনার ব্যাপ্তি ও বাস্তবায়ন। সন্তানের আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য ও শিক্ষাগুরুর স্নেহাশিস লাভ। বিলাসদ্রব্য, গাড়ি, সুন্দর পোশাক সংগ্রহে মনোনিবেশ। প্রণয়ের দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বয়স্ক মিত্র থেকে সতর্ক থাকা দরকার।

**সিংহ :** উদারতা, শৌখিনতা, উন্নতরুচি, সংস্কৃতি, নীতিনৈতিকতা, পাণ্ডিত্য প্রভাবে জগতের আনন্দযজ্ঞে কর্মস্থানে ভালো সুহৃদ সম্পর্ক, দায়িত্ববৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সন্তানের বিভাগীয় পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা স্থগিত ও শরীরের যত্ন নিন। কর্মপ্রার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রিয়জনের শুভ সংবাদ, প্রবাসী বন্ধুর সান্নিধ্য আনন্দের।

**কন্যা :** শাস্ত্রানুশীলন ও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিদের প্রভূত জ্ঞান অর্জন, বহুজনের মাঝে অধীত জ্ঞানের উপস্থাপনায় জনপ্রিয়তা ও সুধীসমাজে সমাদর। আর্থিক প্রাবল্য থাকায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। চলাফেরায় সতর্ক, কথাবার্তায় সংযম ও বয়স্ক প্রতিবেশীর কূটচালে সতর্ক থাকা দরকার।

**তুলা :** পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয় ও শ্রম দুই-ই বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার মেলবন্ধনে সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধি। জীবনসঙ্গীর জেদ-আত্মম্ভরিতা পারিবারিক অস্বস্তির কারণ। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বিনিয়োগ ও সম্পত্তি সমস্যার অনুকূল পরিবেশ। সপ্তাহের শেষভাগে মিত্র কলহ, মাতার স্বাস্থ্যহানি। সন্তান সম্ভবার গর্ভাশয়ের সমস্যায় উদ্বেগ।

**বৃশ্চিক :** গৃহের পরিবেশ স্বজন সম্পর্ক ও শরীরের যত্ন নিন। কর্মদক্ষতায় প্রশাসনিক দায়িত্বে বিদেশ ভ্রমণ। প্রতিবেশী ও ভ্রাতৃসম্পর্কিতদের সঙ্গে ন্যায়, যুক্তিবাদিতার পরিবর্তে সমঝোতা বা আপোশ শ্রেয়। অ্যাকাউন্টস, কমপিউটার প্রোগ্রামিং, গণিতজ্ঞ, ম্যানেজমেন্ট অর্থনীতিবিদের অপ্রত্যাশিত কোনো সুযোগ যা পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির সহায়ক।

**ধনু :** বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌চাতুর্য, নিষ্ঠা, কর্মকুশলতায় বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। জীবনসঙ্গীর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পেশাগত জীবনে পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে প্রভাব- প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। সমাজসেবামূলক কর্মে দয়ার্দ্রহৃদয় ও মানবিক মুখ— বহুজন যার স্বাদ লাভ করবে।

**মকর :** অচলায়তন ভেঙে বিদ্যা ও ব্যবসায় নতুন দিশা। পারিবার্শ্বিক প্রতিকুল পরিস্থিতি ও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধাচারণ বুদ্ধিমত্তায় মোকাবিলা করুন। কর্মস্থানে রমণীর মায়াজালে উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে রাহুর গ্রাস। যুক্তিবাদী মনোভাব, অপ্রিয় সত্য কথন মানসিক অস্থিরতার কারণ। মান-সম্মান ও আয়ের ক্ষেত্রে শুভ বলা যায় না।

**কুম্ভ :** অর্থাগমের দিকগুলি নব আলোকে উদ্ভাসিত ও উজ্জীবিত করবে। পৈতৃক ব্যবসায় প্রসার, গুরুজনের পরামর্শ ও যে-কোনো বিষয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। বিবাদ-বিতর্ক, জেদ পরিহার ও শরীরের যত্নের প্রয়োজন। সন্তানের কৃতিত্বে মনোরম স্থানে ভ্রমণ। ব্যায়াম, ক্রীড়াবিদ, প্রমোটিং, হার্ডওয়ার ও স্টেশনারি ব্যবসায় সাফল্য ও কৃতিত্ব।

**মীন :** কর্মে নানাবিধ অনুকূল পরিস্থিতি, নতুন কর্মের সুলুকসন্ধান ও উচ্চপদ প্রাপ্তি। কোমল হৃদয়বৃত্তি ও দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ব ও সহায়তা। অবিবাহিতের বিবাহ ও সমৃদ্ধির নব আঙ্গিকে নবাগতার সৌভাগ্য ফলদায়ক। রাজনীতিকদের নয়া মোড়, সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক যত্নের প্রয়োজন। তেজ ও বিক্রমের বাড়াবাড়ি বিষয়ে সংযত থাকুন।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য